খুররম মুরাদ

কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা

খুররম মুরাদ

অনুবাদ
মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com E-mail : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-842-012-6

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯১
নবম প্রকাশ : যুলহিজ্জা ১৪৩৪
কার্তিক ১৪২০
অকটোবর ২০১৩

মুদ্রণ : আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

বিনিময় ঃ আশি টাকা মাত্র

Quran Addhayan Shahaika Written by Khurram Murad Translated by Muhammad Qamaruzzaman & Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 first Edition June 1991 Tenth Edition October 2013 Price Taka 80.00 Only

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা

'Way to the Quran' বইটি লিখেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব খুররম মুরাদ। আধুনিক বিশ্বে যে ক'জন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ যুগোপযোগী চিন্তার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন এবং অধুনিক যুব মানসে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের মধ্যে খুররম মুরাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য লিখিত তাঁর বই "ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক" যে কোন পাঠকের হৃদয় না স্পর্শ করে পারেনা। এছাড়াও অনেক সৃজনশীল রচনা রয়েছে তাঁর। পেশাগত দিক থেকে একজন খ্যাতিমান প্রকৌশলী ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি ইসলাম সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছেন, তা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-যুবকদের জন্য অনুসরণযোগ্য। তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভাষার সৌন্দর্য-মাধুর্য ও হৃদয়গ্রাহিতা। মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করা, আলোড়িত করা ও উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে তাঁর লেখনী সত্যিই অসাধারণ।

'Way to the Quran' বইটি যখন আমার হাতে আসে তখন স্বাভাবিকভাবেই আমি বইটি দ্রুত পড়ে ফেলি। ইংরেজিতে লেখা তাঁর বইটি প্রথম পাঠেই আমাকে অভিভূত করে। আমার বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁর এই হৃদয়স্পর্শী রচনাটি বাংলা ভাষায় পাঠকদের জন্য পবিত্র কুরআন মাজীদ পড়া ও হৃদয়ঙ্গম করার জন্য খুবই সহায়ক হবে। বইটি আমাকে পড়তে দিয়ে অগ্রজপ্রতিম জনাব মীর কাসিম আলীও অনুরূপ কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এই বইটির বাংলা তরজমা হওয়া জরুরী। এ থেকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যাপক তরুন ছাত্রসমাজ লাভবান হতে পারবে।" বইটি দ্বিতীয়বার পড়ার পর সাহস করে বাংলা তরজমায় হাত দেই। আমার মত অতি সাধারণ একজন কর্মী যার ইংরেজি বা বাংলা ভাষার ওপর কোন দখল নেই, উপরন্তু আরবী ভাষা থেকে পবিত্র কুরআন মাজিদ বুঝার কোন যোগ্যতা নেই, তার পক্ষে এ ধরনের একটি অতি মূল্যবান বইয়ের তরজমায় হাত দেয়া ঠিক হবে কি হবেনা এ নিয়েও দ্বন্দ্বে ভুগেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বইটির ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং অনুরাগের কারণেই অনুবাদ সম্পন্ন করি।

আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, পবিত্র কুরআন থেকে শিক্ষা লাভ করে হৃদয় আলোকিত করা এবং কুরআনের মহান শিক্ষা অনুধাবন ও অনুসরণ করার ক্ষেত্রে এই বইটি বিরাট অবদান রাখতে পারে। কুরআন বুঝার জন্য, ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত হতেই হবে– এমন ধারণা যদি বদ্ধমূল হয়ে যায়, তাহলে ভয়ে কেউ কুরআনের তরজমা, তাফসীর থেকে শিক্ষা লাভে অগ্রসর হতে পারবে না। কিন্তু এই বইটির লেখক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যে পদ্ধতিতে কুরআন অধ্যয়নের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এবং কুরআন থেকে ফায়দা লাভের পরামর্শ দিয়েছেন, তা অনুসরণ করা হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কুরআনকে জানা ও বুঝা অনেক সহজ হয়ে যাবে। আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআন মাজীদ বুঝা ছাড়া ইসলামকে জানা সম্ভব নয়। আর মানব জাতির হিফাযাত ও পরকালীন মুক্তির জন্য ইসলাম ছাড়া কোন বিকল্প নেই। সুতরাং কুরআন বুঝা ও জানার ব্যাপারে আমাদের অনুসন্ধিৎসা থাকতেই হবে। আর বিশেষ করে ভাষাগত অসুবিধার জন্য মূল উৎস থেকে আমরা যারা কুরআনকে সরাসরি বুঝতে পারিনা, তাদের জন্য তরজমা ও তাফসীর থেকেই বুঝার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের এ প্রয়াসে Way to the Quran একটি বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। এ কারণেই সবকিছুই বিবেচনা করে আমি বইটির বাংলা নাম দিয়েছি– 'কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা'।

বইটি পাঠ করে বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠক যদি সামান্যতমও উপকৃত হন, তাহলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। অসতর্কতাবশত বইটির অনুবাদে ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া ছাপার ভুলও খুব স্বাভাবিক। ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করবো পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরো উন্নত ও নির্ভুল করতে। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। যারা আমার এই ক্ষুদ্র অনুবাদ বইটি প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন আল্লাহ তাদের পুরস্কৃত করুন। আমার স্ত্রী নুরুন্নাহারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ না করে পারছি না। তার সহযোগিতা না হলে ব্যস্ততার মাঝে এই বইয়ের অনুবাদ সম্পন্ন করা সম্ভব হতনা। সবশেষে আমি মহান আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁর মেহেরবাণীতে বইটির তরজমা করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন ॥

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

৫ জুন, ১৯৯১
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা।

ভূমিকা ঃ

আমার মত একজন ঈমানে ও আনুগত্যে দুর্বল অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রথমেই এই ধরনের একটি বই লেখার চরম অযোগ্যতা স্বীকার করে নেয়া কর্তব্য মনে করি। কেননা মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

"আমরা যদি এই কুরআনকে কোন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তোমরা দেখতে পেতে আল্লাহর ভয়ে পর্বত ধসে পড়ত এবং খণ্ড-বিখণ্ড ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো" (সূরা হাশর ঃ ২১)।

একজন মানুষ যার রয়েছে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং আত্মার পবিত্রতার অভাব, তিনি কি করে মহান গ্রন্থ আল কুরআনের মাহাত্ম্য, করুণা, সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে দিক-নির্দেশের দুঃসাহস করতে পারেন। যা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তা হলো আমার অনেক বন্ধুর অব্যাহত তাগাদা। তারা অনুভব করেছিলেন যে, এ সম্পর্কে আমি যা ভাবি বা চিন্তা-ভাবনা করি, তাতে আরো অনেককে শরীক করা প্রয়োজন। কিন্তু আমার সত্যিকারের সাহস বা শক্তি আসে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সেই ওয়াদা থেকে, যেখানে তিনি বলেছেন-

"যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে অবশ্যই আমি তাদের পথ প্রদর্শন করে থাকি" (সূরা আনকাবূত ঃ ৬৯)।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী হচ্ছে :

"আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দাও যদি তা একটি আয়াতও হয়" এবং "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তিনি, যিনি কুরআন শিক্ষা লাভ করেন এবং কুরআনের শিক্ষা প্রচার করেন।"

এ বাণী আমার এ কর্তব্য সম্পর্কে আমাকে আরও ব্যাকুল করে তোলে।

আমার এ বই লেখার লক্ষ্য খুবই সাধারণ। এটা কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা নয়।

আমি একজন সু-পণ্ডিত মুফাস্‌সিরও নই অথবা পণ্ডিত গবেষকদের জন্যও এ বই লিখছি না। শিক্ষা বা দিক-নির্দেশনা দেয়ার সাহস আমি করছি না। কারণ এ কাজের যোগ্যতা আমার নেই। আমি সেইসব সাধারণ অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত কুরআন সন্ধানী লোক বিশেষভাবে যুবক-যুবতীদের জন্য লিখছি, যারা আমার মত কুরআন বুঝার আকাঙ্ক্ষা পূরণ, কুরআনের মর্মবাণী এবং কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য কঠিন সংগ্রামে নিয়োজিত। আমি ছাত্রদের জন্য এমন একটি বিষয়ই লিখছি, যা আমি নিজেই শিখছি। আমার সমস্ত দুর্বলতাসহ কুরআনের সহজ এবং পুরস্কৃত পথে চলতে একজন পথচারী হিসেবে আমার হোঁচট খাওয়া ও চড়াই-উৎরাই এর অভিজ্ঞতা যা আমি উপলব্ধি করেছি এবং প্রয়োজনীয় মনে করেছি তা-ই এই বইয়ের মাধ্যমে আর একজন কুরআনের পথিকের জন্য লিখছি। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, তারা তাদের গভীর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং যোগ্যতার মাধ্যমে এই বইতে আমি যে উপহার তাদের দিয়েছি তাকে আরও উন্নত করতে সক্ষম হবেন।

এই বইটি হলো দীর্ঘ এবং অদ্যাবধি অব্যাহত অনুসন্ধান এবং অনেক বছরের অধ্যয়নের ফসল। আজ থেকে কয়েক দশক আগে যখন আমি সবেমাত্র কুরআন অনুযায়ী চলার সংগ্রামের সূচনা করি এবং প্রতিশ্রুতিশীল একদল তরুণ ছাত্রকে কুরআন অধ্যয়নের উপায় ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়, তখন আমি যা বলেছিলাম তা হলো- আমি নিম্নোক্ত উৎসসমূহের কাছে ঋণীঃ হামীদউদ্দীন ফারাহীর তাফসীরে ফারাহী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর তাফহীমুল কুরআন, আমীন আহসান ইসলাহীর তাদ্দাব্বুরে কুরআন, আল-গাযালীর ইহ্‌ইয়ায়ে উলূমিদ্দীন, শাহ ওয়ালিউল্লাহর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা এবং আল-ফাওযুল কবীর ফী উসূলিত তাফসীর, সুয়ূতির আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন। আমি কৃতজ্ঞতার সাথে এইসব গ্রন্থের ঋণ স্বীকার করছি যদিও বা আমার নিজের কোন বুঝার ভুল বা উপস্থাপনার ভুলের জন্য তাঁরা দায়ী নন। আমার চিন্তা ভাবনাগুলোকে লিপিবদ্ধ করার প্রথম সুযোগ আসে ১৯৭৭ সালে যখন আমি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন (ইউ.কে.) কর্তৃক প্রকাশিত আল্লামা ইউসুফ আলীর পবিত্র কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা "কুরআনের পথে" লিখি। কতগুলো স্থায়ী প্রত্যয় থেকেই এই বইটির জন্ম। বইটিতে সেসবের

ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। কিন্তু তথাপি সংক্ষেপে সেসবের কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করি।

এক ঃ আল্লাহর অবতীর্ণ গ্রন্থ কুরআন অনুযায়ী যদি আমরা পরিচালিত না হই, তাহলে আমাদের জীবন অর্থহীন এবং ধ্বংস হতে বাধ্য।

দুই ঃ চিরঞ্জীব আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কুরআনকে অনন্তকালের জন্য মানব জাতির পথ-নির্দেশনা হিসেবে দেয়া হয়েছে, তা আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগেও যেমন আজকেও তেমনি এবং অনন্তকালব্যাপী সেরূপ শাশ্বত থাকবে।

তিন ঃ কুরআনের প্রথম বিশ্বাসীদের মত আমরাও এর আশীর্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম এবং এ অধিকার আমাদের আছে। অবশ্য যদি আমরা এর নিকটবর্তী হই এবং এর থেকে ফায়দা হাসিলে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারি।

চার ঃ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এটা একটি কর্তব্য যে, তিনি কুরআন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করবেন, বুঝতে চেষ্টা করবেন এবং মুখস্থ করতে চেষ্টা করবেন।

পাঁচ ঃ কুরআন তাকে যা কিছু দিয়েছে তার প্রেক্ষিতেই একজনকে তার নিজস্ব সবকিছু কর্মে ও চিন্তায় পরিহার করতে হবে। যে কোন অহংকার, গর্ব, একগুঁয়েমি, স্বনির্ভরতার ভাব, আপত্তি, অনীহা, যথার্থ নয় বলে গণ্য করা ইত্যাদি কুরআন বুঝার জন্য খুবই মারাত্মক বাধা হতে বাধ্য এবং আশীর্বাদের দরজাও বন্ধ করে দিতে পারে।

ছয় ঃ কুরআনের পথ হচ্ছে নিজেকে সমর্পণের পথ, অনুশীলনের পথ- যদি কেউ একটি আয়াতও শিখে। একটি আয়াত শিখা এবং সে অনুযায়ী আমল বা কর্ম সম্পাদন এমন হাজার আয়াত থেকে উত্তম, যা খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয় অথচ পাঠকের জীবনে সেই সৌন্দর্যের কোন প্রতিফলন ঘটে না। আনুগত্যই হচ্ছে মূলতঃ কুরআন হৃদয়ঙ্গম করা বা বুঝার সত্যিকারের চাবিকাঠি।

এই বইটির ৭টি অধ্যায় রয়েছে। প্রত্যেকটি কুরআনের পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করেছে। প্রথম অধ্যায়ে আছে আমাদের জীবনে কুরআনের পথে চলার অর্থ বা তাৎপর্য কি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনায় হৃদয় ও মনের গভীরে কোন্ সব শর্তের সমাবেশ ঘটাতে হবে, তা আলোকপাত করা হয়েছে। হৃদয়, মন ও দেহের জন্য কোন্ ধরনের মেজাজ ও তৎপরতা প্রয়োজন তা বর্ণনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। চতুর্থ অধ্যায়ে আছে অধ্যয়নে কি ধরনের বিধি মেনে চলা উচিত। পঞ্চম অধ্যায়ে কেন এবং কিভাবে বুঝতে হবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে একজন মানুষ কি করে তার জীবনকে কুরআনের মিশনের পরিপূর্ণতার পথে উৎসর্গ করতে পারে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন নির্দিষ্ট অংশ সম্পর্কে কি বলেছেন, তা একটি পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্য একটি পরিশিষ্টে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অধ্যয়নের জন্য একটি পাঠক্রম নির্দেশ করা হয়েছে, যা অনেকের জন্য বেশ কাজে লাগতে পারে। পাঠ-সহায়িকা হিসেবেও আরো কিছু জিনিস সংযোজিত হয়েছে।

এটা এমন কোন বই নয়, যা তাড়াহুড়ো করে একবার পাঠ করে রেখে দেয়া যায়। যদি পছন্দ না হয় বা প্রয়োজনীয় বলে মনে না হয় তবে ভিন্ন কথা। যাদের এ ধরনের একটি বইয়ের প্রয়োজন আছে এবং এটাকে খুবই দরকারী বলে মনে হয়, আমি আশা করি প্রতিটি অধ্যায়ই তারা বিশেষ সময় দিয়ে বারবার অধ্যয়ন করবেন। তাদের কাছে আমার আবেদন, এই বইটিকে আপনারা একজন সার্বক্ষণিক সাথী হিসেবে নিয়োজিত করতে পারেন।

কতিপয় বিষয়ে খুবই সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করতে হবে। কিছু আপনাকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে এবং কিছু আপনাকে বারবার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। কিন্তু যা আপনি অনুশীলন করবেন, তাই হবে আপনার জন্য খুব মূল্যবান। এই গ্রন্থ পথের সীমানা নির্দেশ করেছে এবং ফলক চিহ্ন রচনা করে দিয়েছে, যাতে পথিক তার পথ সঠিকভাবে চিনতে পারে, পথ নির্দেশনা, সতর্কতা, হুঁশিয়ারি বা নিষেধাজ্ঞা যা প্রয়োজন পথিক তা পেতে পারে। এতদসত্ত্বে আপনাকে একটি বাহন নিয়ে সুসজ্জিত হতে হবে, এতে জ্বালানি ভর্তি

করে রাস্তায় নামতে হবে এবং তা চালাতে হবে। বইয়ের কোন কিছুই আপনার আন্তরিক আকাঙ্খা, ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ় সংকল্প এবং কঠোর প্রচেষ্টার বিকল্প হতে পারে না।

বইটিতে যেসব সতর্কবাণী ছড়িয়ে আছে, তা গ্রহণ এবং ব্যবহার সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে, আপনি কি নিজস্বভাবেই কুরআন বুঝতে চেষ্টা করছেন, নাকি পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রম ব্যবহার করছেন অথবা অন্য কোনভাবে তা করছেন।

কুরআন বুঝার জন্য প্রত্যেক মুসলিমের ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণের অপরিহার্যতা সম্পর্কে আমি খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছি ও জোর দিয়েছি। আমার মতে, এটাই কুরআনের সবচেয়ে মৌলিক দাবী। অবশ্য আমি এ পথে চলার ত্রুটিগুলো সম্পর্কেও সজাগ এবং তা আমি উল্লেখ করারও চেষ্টা করেছি। এ সম্পর্কে আমি এটাই পছন্দ করবো যে, আপনারা সর্বদা সাইয়েদুনা আবু বকর (রা)-এর সেই বাণী আপনাদের সামনে রাখবেন, যাতে বলা হয়েছে ঃ

"মাটি আমাকে গ্রহণ করবে না, আকাশ আমাকে রক্ষা করবে না, যদি আমি কুরআনের ব্যাখ্যা করতে মনগড়া কথা বলি"।

এ বাণী আমার উপর এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে এবং আমাকে সংযমী ও দৃঢ় হতে প্রেরণা যুগিয়েছে, এ থেকে আপনাদেরও ফায়দা হাসিল করা উচিত। আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি, যখন আমাদের জীবনকে কুরআন কেন্দ্রিক করা খুবই জরুরী এবং অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এটা ছাড়া আমরা মুসলিমরা কোনক্রমেই আমাদেরকে আবিষ্কার করতে পারবো না, আমাদের আমিত্বকে তাৎপর্যময় করতে পারবো না এবং বিশ্ব চরাচরে আমরা কোন সর্বশক্তি লাভ করতে পারবো না। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, কুরআন কেন্দ্রিক জীবন ছাড়া আমরা আমাদের স্রষ্টা ও প্রভুকে কোনক্রমেই সন্তুষ্ট করতে পারবো না। উপরন্তু কুরআন ব্যতীত মানবজাতিও ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে।

আজকে মুসলিমদের মধ্যে এই জরুরী প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্রুতগতিতে উপলব্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কুরআন বুঝার আকাঙ্ক্ষা এবং সে অনুযায়ী জীবন

পরিচালনার স্পৃহা আজ অত্যন্ত ব্যাপক। বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণের ঢেউ এই আকাঙ্ক্ষা, সচেতনতা এবং উদ্দীপনারই ফলশ্রুতি। আমাদের মুসলিম উম্মাহর এ সংকটের দিনে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যদি কিছু লোকের অন্তরে কুরআনের পথে চলার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে এবং এটি যদি তাদের জীবনে পথ চলার সাথী হতে পারে। তাহলে আমার পরিশ্রম ব্যাপক সার্থকতা লাভ করবে এবং পুরস্কৃত হবে। আমার জন্য কেবল তখনই এটা উপকারে আসবে যদি আল্লাহ আমার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করেন এবং আমার এই আন্তরিক প্রচেষ্টা কবুল করেন। যারা এই বই থেকে উপকৃত হবেন, তাদের প্রতি আমার একটিই আবেদন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনার সময় আমাকে ভুলবেন না।

লেস্টার
১৫ শাবান, ১৪০৫ হিজরী — খুররম মুরাদ
৬ মে, ১৯৮৫

১ ঃ জীবনের পথচলা

চিরন্তন ও জীবন্ত বাস্তবতা

কুরআন হচ্ছে মহান প্রেমময় আল্লাহর বাণী। সর্বকালের সকল মানুষের দিগদর্শন হিসেবেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের সাথে কথা বলেছেন। কুরআন পড়ার মানে হচ্ছে আল্লাহর বাণীকে শ্রদ্ধা করা, তাঁর সঙ্গে কথা বলা, তাঁর পথে চলা। এ হচ্ছে জীবন সংগ্রামে জীবনদাতার সম্মুখীন হওয়া। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন (সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনিই তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছেন মহাসত্যসহ মহাগ্রন্থ মানবজাতির দিক-নির্দেশনা হিসেবে (আলে ইমরান ঃ ২-৩)।

তাদের নিকট পবিত্র কুরআন ছিল এক জীবন্ত বাস্তবতা, যারা নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ থেকে সর্বপ্রথম ঐ বাণী শুনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে, নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাধ্যমে মহান প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের সাথেই কথা বলেছেন। আর এ কারণেই তাদের হৃদয় এবং মন সম্পূর্ণভাবে এর দ্বারা দখল হয়ে গিয়েছিল। তাদের দেহে কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল এবং চোখ থেকে নেমেছিল অশ্রুধারা। কুরআনের প্রতিটি শব্দকে অতি গভীরভাবে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির সাথে বাস্তবভাবে সংগতিপূর্ণ দেখেছিলেন এবং এটাকে পরিপূর্ণভাবে তাদের জীবনের সাথে একাত্ম করে নিয়েছিলেন। তারা ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিকভাবে কুরআনের সংস্পর্শে এক নতুন জীবন দানকারী স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলেন। ঐসব লোক একদা যারা মেষ চরাতেন, উট পালন করতেন এবং সামান্য ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিলেন, তারাই এই মহান গ্রন্থ আল কুরআনের বদৌলতে বিশ্বমানবতার নেতৃত্বে সমাসীন হলেন।

ঐ একই কুরআন আজ আমাদের কাছে রয়েছে। কুরআনের লক্ষ লক্ষ কপি আজ প্রচারিত। রাত-দিন বিরামহীনভাবে বাড়ী, মাসজিদ ও মঞ্চ থেকে কুরআন তিলাওয়াত হচ্ছে। এর অর্থ বুঝানোর জন্য বিপুল পরিমাণ ব্যাখ্যামূলক রচনা গ্রন্থাদির সমাহার হয়েছে। কুরআনের শিক্ষা ব্যাখ্যা করার জন্য এবং তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য অব্যাহত গতিতে বের হয়ে এসেছে অনেক শব্দমালা। এতকিছু সত্ত্বেও চোখ আজ শুকনোই রয়ে যাচ্ছে, হৃদয় আলোকিত হচ্ছে না। মন কোন স্পর্শ অনুভব করছে না। বিপর্যয় এবং অধঃপতনই যেন আজ কুরআনের অনুসারীদের ভাগ্যের লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন এমনটি হলো? কারণ কুরআনকে তো আমরা জীবন্ত বাস্তবতা হিসেবে গ্রহণ করে অধ্যয়ন করি না। আমরা মনে করি এটা অতীতকালের একটি পবিত্র গ্রন্থ। যাতে মুসলিম, কাফির, ইয়াহুদী, খৃস্টানদের কথা আছে। আর আছে এক সময়ে যারা বিশ্বাসী এবং মুনাফিক ছিলো, তাদের কথা।

১৪০০ বছর আগে কুরআন যেমন ছিল আজও কি তেমনি শক্তিধর, প্রাণবন্ত, প্রেরণাদায়ক শক্তি হতে পারে? এটাই হচ্ছে সবচাইতে কঠিন প্রশ্ন, যার জবাব আমাদের অবশ্যই দিতে হবে, যদি আমরা কুরআনের পথ নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের লক্ষ্যস্থল নুতন করে নির্ধারণ করতে চাই।

মনে হয় এ পথে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল সময়ের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে। ঐ সময় থেকে আমরা অনেক পথ পরিভ্রমণ করে এসেছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং মানবেতিহাসে উল্লেখযোগ্য সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। উপরন্তু আজ কুরআনের অধিকাংশ অনুসারীই আরবী জানেন না এবং অনেকেই আছেন তাদের কুরআনের প্রাণবন্ত ভাষা সম্পর্কে সামান্য ধারণাই রয়েছে। কুরআনের অর্থ গভীরভাবে আত্মস্থ করার জন্য এবং এর পথের সন্ধান লাভের জন্য কুরআনের প্রকাশভঙ্গি, বাগধারা, রূপকালংকার সম্পর্কে যতটুকু ধারণা থাকা প্রয়োজন, তাদের কাছে তা আশা করা যায় না। এতদসত্ত্বেও শাশ্বত স্রষ্টার বাণী হওয়ার কারণেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেই সকল মানুষের জন্য কুরআনের পথ

নির্দেশনার এক সার্বজনীন আবেদন রয়েছে। এই সত্যতার জন্যই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কুরআনের প্রথম শ্রোতাদের মতই আমাদের পক্ষেও কুরআন বুঝা, হৃদয়ংগম করা, গ্রহণ করা সম্ভব হবে, পুরোপুরি না হলেও অন্ততপক্ষে একটি পর্যায় পর্যন্ত। আমাদের বিশ্বাস, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যসহই আল্লাহর পথ-নির্দেশনা লাভের অধিকার এবং সুযোগ আমাদের আছে। অন্যকথায় বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট ভাষায়, একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হলেও যেহেতু কুরআনের বাণী চিরন্তন এবং সার্বজনীন, সেহেতু কুরআনকে বুঝা ও গ্রহণ করার সামর্থ আমাদের থাকা উচিত। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের চিরন্তনতার কারণেই প্রথম বিশ্বাসীদের মতই আমাদের উচিত কুরআনের বাণীর সাথে জীবনকে সম্পূর্ণ একাত্ম করে নেয়া এবং অপরিহার্যভাবে সকল বিষয়ে কুরআনের নির্ধারিত পথে চলা।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কি করে এটা সম্ভব? এ সম্পর্কে খুবই স্পষ্ট করে বলা যায় যে, কুরআনের মধ্যে আমরা এমনভাবে প্রবেশ করি যেন আল্লাহ আজই এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কথা বলছেন এবং যাবতীয় শর্তসমূহ পূরণ করে সে ধরনের একটা পরিস্থিতির যদি সম্মুখীন হই, তখনই কেবল পবিত্র কুরআন বুঝা, হৃদয়ংগম করা বা গ্রহণ সম্ভব হবে।

প্রথমত ঃ আল্লাহর বাণী হিসেবে কুরআন কি এবং আমাদের নিকট কুরআনের তাৎপর্য কি, তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে এবং এই উপলব্ধি যে তৎপরতা দাবী করে- সকল মহিমা, ভালোবাসা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছাসহ তদনুযায়ী কাজ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ সেইভাবে কুরআন পড়তে হবে যেভাবে আমাদের পড়তে বলা হয়েছে, আল্লাহর বাণীবাহক যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং যেভাবে তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ পড়েছেন।

তৃতীয়ত ঃ কাল, কৃষ্টি ও পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে কুরআনের প্রতিটি শব্দকে আমাদের জীবনের বাস্তবতা, অভিজ্ঞতা ও সমস্যার সাথে সম্পর্কিত করতে হবে।

কুরআনের প্রথম শ্রোতাদের জন্য এটা ছিল তাদের সমকালীন প্রসংগ। কুরআনের ভাষা এবং রচনাশৈলী, যুক্তি এবং অলংকার, বাগধারা এবং রূপক, উপমা এবং উৎপ্রেক্ষা, কাল এবং ঘটনা সবকিছুই একটা বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি যেহেতু তাদের নিজেদের কালের, সেহেতু কুরআনের প্রথম শ্রোতাগণ একদিকে যেমন ছিলেন এর সাক্ষী অন্যদিকে তেমনি তৎকালীন ঘটনা প্রবাহের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী। এই একই সুযোগ আমাদের নেই। এতদসত্ত্বেও বলা যেতে পারে একই ব্যাপার আমাদের বেলায় ঘটতে বাধ্য।

আমাদের অবস্থান থেকে কুরআন হৃদয়ংগম এবং অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাবো যে, আগের লোকদের কাছে এটা যেমনি ছিল সাম্প্রতিক বা সমকালীন, তেমনি আমাদের কাছেও। এর অন্তর্নিহিত কারণ এটাই যে, মানুষের সত্তার পরিবর্তন হয়নি এবং তা অপরিবর্তনীয়। কেবল তার বাহ্যিক আচরণ, অবয়ব, ধরন ও প্রযুক্তির পরিবর্তন হয়েছে। মক্কায় পৌত্তলিকরা হয়তো বা নেই, নেই ইয়াসরিবের ইয়াহূদীগণ কিংবা নাজরানের খৃস্টানগণ, মদীনার বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীগণও নেই, কিন্তু আমরা আমাদের চারিদিকে একই চরিত্রের অস্তিত্ব অনুভব করি। প্রথম শ্রবণকারীদের মত আমরা অবিকল একই মানুষ। তথাপি এ সহজতম সত্যটির গভীর তাৎপর্য হৃদয়ংগম করা আমাদের অনেকের জন্য খুবই কঠিন।

আপনি যদি এই সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং তা অনুসরণ করেন এবং যেভাবে প্রথম বিশ্বাসীগণ কুরআনের নিকটবর্তী হয়েছিলেন, আপনার কাছেও ঠিক তেমনি মনে হবে যেমনটি মনে হয়েছিল তাদের নিকট এবং আপনারা তাদের মত ঘটনার অংশীদারে পরিণত হবেন, কেবল তখনই কুরআন মাজীদ একটি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং অলৌকিক আশীর্বাদের গ্রন্থ হওয়ার পরিবর্তে প্রেরণাদায়ক, আলোড়ন সৃষ্টিকারী, গতিশীল এবং সুগভীর ও সর্বোচ্চ সাফল্যদানকারী শক্তিতে পরিণত হবে, যেমনটি হয়েছিল সেকালের লোকদের জন্য।

নুতন পৃথিবীর হাতছানি

কুরআনের সান্নিধ্যে আসলে আপনি একটি নতুন পৃথিবীর সন্ধান পাবেন। আর কোন জিনিসই আপনার জীবনে কুরআনের দিকে সফরের মত এত মূল্যবান, গুরুত্বপূর্ণ, আশীর্বাদময় এবং উত্তম ফলদায়ক হতে পারে না। যিন্দেগীর এই সফর আপনাকে এমনি এক অশেষ আনন্দ এবং সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে যা আপনার স্রষ্টা এবং প্রভু আপনার এবং মানবজাতির জন্য পাঠিয়েছেন। আপনার চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডকে পরিশীলিত করার জন্য জীবনে চলার পথের নির্দেশনা, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার এক অফুরন্ত ভান্ডারের সন্ধান পাবেন আপনি এই কুরআনে। এতে আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন আপনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য গভীর দূরদৃষ্টি এবং পাবেন সত্য পথে চলার জন্য উজ্জীবনী শক্তি। এ থেকে আপনি গ্রহণ করতে পারবেন আপনার অন্তরের গভীরতম প্রদেশকে আলোকিত করার জন্য প্রোজ্জ্বল আলোক-রশ্মি। আপনার গাল বেয়ে নামার মত অশ্রুধারা এবং হৃদয় বিগলিত হওয়ার মত উত্তাপ আর নির্মল আবেগের মুখোমুখি হবেন আপনি এই মহাগ্রন্থে।

এটা আপনার জন্য খুবই কঠিন ব্যাপার হবে, যেহেতু কুরআনের পথে চলতে প্রতিটি পদক্ষেপে আপনাকে বেছে চলতে হবে। আল্লাহর প্রতি আপনার অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। কুরআন পড়ার মানে হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ততা, আন্তরিকতা, গভীর মনোনিবেশ এবং সামগ্রিকভাবে কুরআনের সাথে বেঁচে থাকা। আপনি কিভাবে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিবেন তার উপরই নির্ভর করে আপনার সারা জীবনের সাফল্য। সুতরাং কুরআনের পথে চলার উপর নির্ভর করে আপনার অস্তিত্ব। মানুষ এবং মানব সভ্যতার ভবিষ্যত।

শত শত নতুন শব্দ আছে এই পদাবলীতে
শতাব্দীর পর শতাব্দী সংশ্লিষ্ট আছে এর ক্ষণিকের মাঝে।

(জাভেদনামা ঃ আল্লামা ইকবাল)

জেনে রাখুন, এই হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন। শুধু এই কুরআনই আপনাকে এ দুনিয়ায় এবং পরলোকে সত্যিকারের সাফল্য এবং গৌরবের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

কুরআন কি?

মানুষের জন্য কুরআনের গুরুত্ব এবং মহত্ত্ব যে কত বিশাল এবং ব্যাপক, তা বর্ণনা করা তার জন্য সাধ্যতীত। তথাপি কুরআন যে প্রতিশ্রুতি, পূর্ণ মনোনিবেশ এবং বিরামহীন প্রচেষ্টা দাবী করে, তা নিয়ে যাতে আপনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উদ্দীপনার সাথে কুরআনের মধ্যে নিমজ্জিত করতে পারেন, সেজন্য সূচনাতেই কুরআন কি এবং এর তাৎপর্য কি, সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু ধারণা নিতে হবে।

কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য এক মহান নিয়ামত। এটি হচ্ছে আদম (আ) এবং তাঁর উত্তরসূরীদের প্রতি প্রদত্ত মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা।

অতঃপর আমার নিকট থেকে যে জীবনবিধান তোমাদের নিকট পৌঁছবে, যারা আমার সেই বিধান মেনে চলবে, তাদের জন্য কোন চিন্তা ও ভাবনার কোন কারণ থাকবে না (আল বাকারা ঃ ৩৮)।

দুনিয়ার লোভ-লালসা এবং শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য এটিই হচ্ছে আপনার ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের একমাত্র সহায়ক হাতিয়ার। আপনার ভয় এবং দুশ্চিন্তা দূর করার এটিই হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম। অন্ধকারের অমানিশায় মুক্তি ও সাফল্যের পথ দেখার জন্য এটিই হচ্ছে একমাত্র আলোকবর্তিকা (নূর)।

আপনার ভিতরের অসুস্থতা এবং যে সামাজিক ব্যাধি আপনাকে প্রতিনিয়ত গ্রাস করতে চায়, তার একমাত্র নিরাময় (শিফা) এটিই। এ হচ্ছে আপনার প্রকৃতি, গন্তব্য, অবস্থান, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং ধ্বংস সম্পর্কে স্থায়ী এক স্মরণিকা (যিক্‌র)।

কুরআনকে ধরাপৃষ্ঠে বহন করে আনেন জান্নাতের এক শক্তিধর এবং বিশ্বস্ত ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ)। আল্লাহর নিকট থেকে বহন করে আনার পর কুরআনের প্রথম আবাস ছিল প্রিয় নবীজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এবং মহিমান্বিত আত্মা, যা আর কোন মানুষের সাথে তুলনীয় হতে পারে না।

সবচাইতে বড় কথা, এটিই হচ্ছে মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য এবং নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ। এই মহাগ্রন্থ আপনাকে আল্লাহ এবং আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত করে। কিভাবে মহান স্রষ্টা নিখিল বিশ্ব শাসন করেন এবং স্রষ্টার সাথে আপনি কিভাবে সম্পর্কিত এবং আপনার তাঁর সাথে এবং আপনার সাথে অন্য মানুষের এবং মানুষের সাথে অন্য সৃষ্টির কি ধরনের সম্পর্ক হওয়া উচিত, তাও তিনি অবহিত করেছেন কুরআনে।

কুরআনের পথে চলার যে পুরস্কার এ পৃথিবীতে নিঃসন্দেহে তা অনেক এবং আরো অফুরন্ত ও অনন্ত পুরস্কার রয়েছে আখিরাতে। কিন্তু এই পথ শেষে যা আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, চোখ কখনো দেখেনি, কান কোনদিন শোনেনি, মানুষের হৃদয় কোনদিন অনুভব করেনি। ইচ্ছা হলে পড়ে দেখতে পারো সূরা আস্ সাজদা-১৭। তাছাড়া তাদের কর্মের প্রতিফল স্বরূপ তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে কোন প্রাণীরই তার খরব নেই।

অসীম করুণা এবং মহিমা

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যা কুরআনে পড়া হয়, তা বিশ্বজাহানসমূহের প্রভু মহান আল্লাহর বাণী। তিনি মানুষের জন্য দয়া, করুণা ও ভালোবাসার কারণেই মানবীয় ভাষায় তা মানবজাতিকে উপহার দিয়েছেন।

পরম দয়ালু যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন (আর রাহমান ঃ ১-২)।

তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে একটি করুণা (আদ দুখান ঃ ৬)।

আল্লাহর মহিমা এত অসাধারণ শক্তির অধিকারী, যা কোন মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আল্লাহ নিজেই বলেছেন-

আমরা যদি এই কুরআন কোন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করে দিতাম, তাহলে তুমি দেখতে যে, তা আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে বসে যাচ্ছে এবং দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে (আল হাশর ঃ ২১)।

মহান আল্লাহর এই দয়া এবং মহিমা মানুষকে বিস্মিত এবং কৃতজ্ঞতার সর্বোচ্চ

শিখরে উদ্বুদ্ধ করতে প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করার জন্য যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, কুরআনের চাইতে আর কোন সম্পদই মানুষের নিকট মূল্যবান হতে পারে না।

যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

হে মানব সমাজ! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের নিকট থেকে নসীহত এসে পৌঁছেছে, যা দিলের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময়কারী, আর যে তা কবুল করবে, তার জন্য হিদায়াত ও রহমত নির্দিষ্ট হয়ে আছে। হে নবী, বল ঃ এটি আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার করুণা যে, তিনি এটি পাঠিয়েছেন। এজন্য তো লোকদের আনন্দ-ফূর্তি করা উচিত। এটি সেইসব জিনিস থেকে উত্তম যা লোকেরা সংগ্রহ ও আয়ত্ত করছে (সূরা ইউনুস ঃ ৫৭-৫৮)।

বিপদ ও ঝুঁকি

আল্লাহর দয়া, মহিমা এবং মহানুভবতা আপনাকে অবশ্যই উদ্বেলিত করবে, আনন্দিত করবে। আপনার মধ্যে প্রেরণা ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলবে। কিন্তু কুরআন তাদের জন্য হিদায়াতের দরজা খুলে দেয়, যারা আল্লাহর এই করুণার গুরুত্ব বুঝে হৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতা, আন্তরিকতা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা ও মনোনিবেশ সহকারে কুরআনের দ্বারস্থ হয়। তারাই কেবল কুরআনের মহিমাময় সম্পদ আহরণ করতে পারে, কুরআন অনুশীলন করতে গিয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে কুরআনের নির্দেশ মানতে ও কুরআনের পথে চলতে ও তা গ্রহণ করতে রাজী হয়ে যায়।

এমন ঘটনা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয় যে, একজন অব্যাহতভাবে কুরআন অধ্যয়ন করেন, পাতার পর পাতা উল্টান, চমৎকারভাবে প্রতিটি শব্দ আবৃত্তি করেন, গবেষকদের মত অনুশীলন করেন, তা সত্ত্বেও তার জীবনকে কুরআনের আলোয় সমৃদ্ধ এবং উজ্জীবিত করার মত পরিস্থিতির সম্মুখীন তিনি নাও হতে পারেন। কেননা, যারা কুরআন পড়েন, তাদের সকলেই কুরআন থেকে যেভাবে লাভবান হওয়া উচিত সেরূপ লাভবান হতে পারেন না। অনেকে কুরআনের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে আর অনেকে অভিশপ্তও হতে পারে।

কুরআনের পথে আছে মূল্যবান এবং অফুরন্ত পুরস্কার, ঠিক তেমনি আছে ঝুঁকি

আর বিপদ। হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও অনেকে এই মহাগ্রন্থের দিকে ফিরেও তাকায় না, অনেকে এর দরজায় গিয়েও ফিরে যায়। অনেকে প্রায়ই গ্রন্থটি পড়ে এবং শূন্য হাতে ফিরে। অনেকেই পড়ে কিন্তু সত্যিকার অর্থে কুরআনের গভীরে প্রবেশ করে না। অনেকে সন্ধান পায় কিন্তু হারিয়ে ফেলে। তারা আল্লাহর শব্দের মধ্যেও আল্লাহকে শুনতে পায় না। আল্লাহর পরিবর্তে তারা নিজেদের কণ্ঠ, নিজেদের শব্দই শুনতে পায়। অনেকে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, কিন্তু আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার মত ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ়তা, সাহস এবং আল্লাহর পথে চলার শক্তি অর্জনে তারা ব্যর্থ হয়। অনেকে তার যা আছে তাও হারায়, জীবনের মূল্যবান নুড়ি আহরণের পরিবর্তে হাড়ভাংগা পাথরের স্তূপ নিয়ে ফেরে, যা থেকে সারাটি জীবন আঘাতই পেয়ে থাকে।

কেউ যদি কুরআনের শরণাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও অন্তরে সংস্পর্শ না লাগে, হৃদয় আলোড়িত না হয়, জীবন অপরিবর্তিত থেকে যায়, খালি হাতে ফিরেন, যেভাবে এসেছিলেন ঠিক সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করেন, তাহলে তার চেয়ে মর্মান্তিক দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

পবিত্র কুরআনের মহিমা এবং আশীর্বাদ সীমাহীন। কিন্তু এ থেকে কে কতটুকু গ্রহণ করতে পারবে, তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে যে পাত্রে এটা গ্রহণ করা হবে তাতে কি পরিমাণ জায়গা আছে তার উপর। সুতরাং কুরআন অধ্যয়নের সূচনাতেই গভীরভাবে এ বিষয়টি সম্পর্কে সজাগ হতে হবে যে, কুরআন কি এবং কুরআনের দাবী কি? যথাযথভাবে কুরআন অধ্যয়নের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যাতে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, যাদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথোপযুক্তভাবে পড়ে, তারা এর প্রতি নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আনে (আল বাকারা ঃ ১২১)।

কুরআন তিলাওয়াত

তিলাওয়াত এমন একটি শব্দ, যা কুরআন পড়ার কাজটি বোঝানোর জন্য কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষায় এক শব্দে

সরাসরি এর অনুবাদ করা যায় না। 'অনুসরণ' করা শব্দটির প্রাথমিক অর্থের সবচাইতে কাছাকাছি, পড়ার ব্যাপারটি দ্বিতীয় পর্যায়ের। কেননা, পড়ার মধ্যেও শব্দ শব্দকে অনুসরণ করে, একটির পর আরেকটি অত্যন্ত গভীরভাবে, সুশৃংখল এবং তাৎপর্যময় ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। যদি একটি শব্দ অপরটিকে অনুসরণ না করে অথবা যদি বিন্যাস এবং ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন হয়, তাহলে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়।

সুতরাং প্রাথমিকভাবে তিলাওয়াত অর্থ ঘনিষ্ঠভাবে পশ্চাতে চলা, সামনে অগ্রসর হওয়া, ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হওয়া, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা চালানো, পথ-প্রদর্শক, নেতা, প্রভু এবং আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা, কর্তৃত্ব গ্রহণ করা, স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা, আমল করা, পথচলা, জীবন ব্যবস্থার অনুশীলন করা, বুঝা, চিন্তার বাহনকে অনুসরণ করা অথবা অনুকরণ করা। কুরআন পাঠ করা, কুরআন বুঝা, কুরআন অনুসরণ করা। যারা দাবী করে যে, কুরআনের প্রতি তাদের বিশ্বাস আছে, এইভাবেই তারা নিজেদের জীবনকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট করতে পারে।

তিলাওয়াত বা আবৃত্তি করা এমনই একটি কাজ যাতে একজন মানুষকে তার দেহ, হৃদয়, মন, ভাষা অর্থাৎ সংক্ষেপে গোটা মানবীয় অস্তিত্ব সহকারেই এতে অংশ নিতে হয়। কুরআন পড়তে দেহ ও মন, যুক্তি অনুভূতি তাদের পার্থক্য হারিয়ে ফেলে এবং সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। যখন জিহ্বার সাহায্যে আবৃত্তি করা হয়, তখন ঠোঁট থেকে শব্দ বের হয়ে আসে, মন চিন্তা করতে থাকে, হৃদয় প্রতিফলিত করে, আত্মা গ্রহণ করে, চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি হয়, শরীরে শিহরণ জাগে। আর এভাবেই সে তার প্রভুর আলোয় পথ চলে।

আল্লাহ্ অতি উত্তম কালাম নাযিল করেছেন এ এমন এক কিতাব যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যাতে বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তা শুনে তাদের গাত্রে লোমহর্ষণ দেখা দেয়, যারা নিজেদের আল্লাহকে ভয় করে। পরে তাদের দেহ ও তাদের দিল নরম হয়ে আল্লাহর স্মরণে উৎসাহী ও উৎসুক হয়ে ওঠে। এ হচ্ছে আল্লাহর হিদায়াত, এর দ্বারা তিনি হিদায়াতের পথে নিয়ে আসেন

যাকে তিনি চান। আর আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত না করেন, তার জন্য হিদায়াতকারী কেউ নেই (আয্ যুমার ঃ ১৩)।

যেভাবে কুরআন পাঠ করা উচিত, সেভাবে কুরআন পড়া সহজ কাজ নয়, কিন্তু খুব কঠিন বা অসম্ভবও নয়। অন্যথায় আমাদের মত সাধারণ লোকদের জন্য কুরআন পাঠানো হতো না কিংবা কুরআন সত্যিকার অর্থে যে করুণা ও পথ-নির্দেশনা দিয়ে থাকে, তা কেউ পেত না। কিন্তু স্পষ্টতই কুরআন অধ্যয়নে অনিবার্যভাবে হৃদয় ও মন, দেহ ও আত্মার কঠিন পরিশ্রম হতে বাধ্য। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে কতগুলো শর্ত মেনে চলতে হবে এবং অনিবার্য দাবী পূরণ করতে হবে। কুরআনের মহিমান্বিত জগতে প্রবেশের আগেই ঐসব বিষয় জানতে এবং তা পালনে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

কেবল তখনই মহান গ্রন্থ আল কুরআনে মানুষের জন্য যে কল্যাণ ও মহিমা রয়েছে তা থেকে ফায়দা গ্রহণ বা ফল বা লাভ সম্ভব হবে। তখনই কুরআনের দরজা একজন মানুষের জন্য খুলে যাবে, কেবল তখনই তিনি কুরআনের অভ্যন্তরে ঢুকতে পারবেন এবং কুরআন তার মধ্যে গভীর চিন্তা ও ভাবাবেগের উদ্রেক করবে। মায়ের গর্ভে নয় মাস অতিবাহিত করার পর এক ফোঁটা পানি হতে রূপান্তরিত হয়ে আপনি শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও চিন্তাশক্তির অধিকারী একজন জীবন্ত মানুষে পরিণত হন। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন জীবনের কতটা সময় আপনি কুরআনের সাথে অতিবাহিত করতে পারেন- অনুসন্ধান, শ্রবণ, দেখা, চিন্তা ও সংগ্রাম করে এবং এটা আপনার জন্য কত প্রয়োজনে আসতে পারে। এটা আপনাকে এক সম্পূর্ণ নতুন মানুষে পরিণত করতে পারে যাদের অনেকের সামনে ফেরেশতারা পর্যন্ত মাথা নত করতে গৌরব বোধ করবেন।

কুরআনে গৃহত প্রতিটি পদক্ষেপ এবং কুরআনের সাথের মুহূর্তগুলো অতিক্রমের মাধ্যমে আপনি অনুভব করবেন যে, আপনি উর্ধ্বমুখে আরোহণ করছেন। কুরআনের প্রবহমান শক্তি ও সৌন্দর্য আপনাকে আঁকড়ে ধরবে এবং আপনি হৃদয় দিয়ে তা উপলব্ধি করতে থাকবেন। আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

কুরআনের সাথীকে বলা হবে, তিলাওয়াত কর এবং উর্ধ্বে আরোহণ কর। দৃঢ়ভাবে আরোহণ করতে থাকো ঠিক যেইভাবে সাবলীলভাবে তুমি কুরআন তিলাওয়াত করতে দুনিয়ায়। তোমার চূড়ান্ত প্রতীক্ষা হচ্ছে সেই উচ্চতা যা তুমি সর্বশেষ আয়াতে পাঠ করেছ। (সুনান আবু দাউদ, জামে আত্ তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, সুনান আন্ নাসাঈ)। ■

২ ঃ মৌলিক পূর্বশর্তাবলী

কুরআনের সাথে সফল সম্পর্কের জন্য হৃদয় ও মনের কতিপয় মৌলিক অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত জরুরী পূর্বশর্ত। যতটা পারা যায় সেগুলোকে সমৃদ্ধ করুন। সেগুলোকে আপনার চেতনার অংশে পরিণত করুন এবং সেগুলোকে চিরঞ্জীব ও সক্রিয় করুন। এগুলো আপনার কর্মে সংহত করুন। আপনার মধ্যে ঐসব হৃদয়াবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করতে দিন। অভ্যন্তরীণ এসব সম্পদের সহযোগিতা ছাড়া আপনি কুরআনের আশীর্বাদ ও করুণা গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন না। জীবন চলার পথে এসবই হবে আপনার অপরিহার্য সাথী ও বন্ধু।

এই অভ্যন্তরীণ সম্পদ কঠিন কিছু নয় এবং এসবের খোঁজ মেলা অসম্ভব কোন ব্যাপারও নয়। সদা সতর্কতা, বিচার-বিবেচনা এবং সঠিক কথা ও কাজের মাধ্যমে আপনি অভ্যন্তরীণ শক্তি অর্জন ও তা বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি যত এটা করবেন, তত আপনি কুরআনের নৈকট্য লাভে সমর্থ হবেন। আর যত বেশি কুরআনের নৈকট্য আপনি অর্জন করবেন আপনার সাফল্য হবে ততো বেশি।

বিশ্বাস ঃ আল্লাহর বাণী

প্রথমত ঃ এ ব্যাপারে শক্তিশালী ও গভীর বিশ্বাস নিয়ে কুরআনের কাছে আসুন, আমাদের মহান স্রষ্টা ও প্রভুর বাণী হচ্ছে এই কুরআন।

কেন এই ধরনের বিশ্বাস একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত? নিঃসন্দেহে কুরআনের শক্তি ও আকর্ষণ এতই বেশি যে, যদি কেউ এটা নিয়ে পড়াশুনা করেন, তাহলে তিনিও এ থেকে উপকৃত হতে পারবেন। যেমন কোন সাধারণ গ্রন্থ থেকে কেউ উপকৃত হন যদি তিনি তা খোলা মনে পড়েন। কিন্তু এই গ্রন্থ কোন সাধারণ গ্রন্থ নয়। এর সূচনাই হয়েছে জোরালো বক্তব্য দিয়ে, এটা আল্লাহর কিতাব এর মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই (আল বাকারা ঃ ২)।

কুরআন পাঠে ও অধ্যয়নে আপনার উদ্দেশ্য কোন সাধারণ উদ্দেশ্য নয়। আপনি

এ থেকে দিক-নির্দেশনা বা হিদায়াত চাচ্ছেন, যা আপনার পুরো যিন্দেগীকে বদলে দেবে। আপনাকে সহজ সরল সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে আনবে ও পরিচালিত করবে। "আমাদেরকে সহজ সরল পথ দেখাও হে প্রভু" (সূরা আল ফাতিহা ঃ ৫)! এই আর্ত চিৎকারেরই জবাব হচ্ছে আল কুরআন।

আপনি কুরআনের প্রশংসা করতে পারেন, এমনকি কুরআন থেকে অনেক কিছু অবহিত হতে পারেন, কিন্তু কুরআন আপনাকে পরিবর্তন করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এর বাণী আপনাকে জাগাতে পারছে, আঁকড়ে ধরছে, আপনাকে নিরাময় করছে এবং বদলিয়ে দিচ্ছে। সেগুলো যে অর্থে আল্লাহর বাণী আপনি তা সেভাবে গ্রহণ না করা পর্যন্ত এটা হতে পারে না। কুরআনের গভীরতায় পৌঁছতে এবং তার বাণী আত্মস্থ করতে যেসব অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও শক্তি প্রয়োজন, বিশ্বাস ছাড়া তা অর্জনই সম্ভব নয়। এটা যদি একবার আপনার হৃদয়ে আসন করে নেয়, তাহলে উদ্দেশ্যের ঐকান্তিকতা, বিনয় ও সম্ভ্রম, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা, আস্থা, নির্ভরশীলতা, কঠোর পরিশ্রমে আগ্রহ, এর সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা, এর বাণীর প্রতি আত্মসমর্পণের মনোভাব, এর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য, কুরআনের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারে এমন বাধা-বিপত্তি সম্পর্কে সতর্কতা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীতে বিভূষিত না হয়ে আপনি পারেন না।

আপনি আল্লাহর মহানুভবতা, গৌরব ও শক্তি সম্পর্কে ভাবুন, আপনি তাঁর বাণীর জন্য অনুভব করবেন সম্ভ্রম, বিনয় ও গভীর অনুরাগ। আপনি তাঁর দয়া ও করুণার কথা বিবেচনা করুন, আপনার হৃদয় কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা ও তাঁর বাণীর প্রতি আকাঙ্ক্ষায় ভরপুর দেখতে পাবেন। তাঁর প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও করুণা সম্পর্কে জানুন- আপনি আগ্রহী, উদগ্রীব ও প্রস্তুত হয়ে উঠবেন তাঁর নির্দেশ মানার জন্য। এ কারণেই অনেক সূরার সূচনাতেই বার বার কুরআন আপনাকে এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আর এ কারণেই মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে নিজের বিশ্বাস সম্পর্কে ঘোষণা দেয়ার জন্য– বল হে রাসূল, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি (আশ শুরা ঃ ১৫)।

রাসূল সেই হিদায়াত বা পথ-নির্দেশকেই বিশ্বাস করেছেন, যা তাঁর পরোয়ারদিগারের নিকট হতে তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে (আল বাকারা ঃ ২৮৫)।

আপনাকে অবশ্যই এ ব্যাপারে সদা সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যে, প্রতিটি শব্দ যা আপনি পড়ছেন, শুনছেন, আবৃত্তি করছেন বা বুঝার চেষ্টা করছেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

আপনার কি সত্যিকার অর্থে এ বিশ্বাস আছে? এর জবাবের জন্য খুব বেশিদূর যাবার প্রয়োজন নেই। কেবল আপনার অন্তর ও ব্যবহারকে পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণই এজন্য যথেষ্ট। সত্যিই যদি আপনার এ বিশ্বাস থাকে, তাহলে কোথায় কুরআনের সাহায্য লাভে আপনার ব্যাকুলতা ও আকাঙ্ক্ষা, কোথায় কুরআন বুঝার জন্য আপনার সেই সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম, কোথায় সেই মহান বাণীর প্রতি আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য?

কি করে এ বিশ্বাস অর্জন করা যাবে এবং কি করেই বা এ বিশ্বাসকে জীবন্ত রাখা যায়? এ জন্য অনেক উপায় রয়েছে। মাত্র একটির কথা আমি উল্লেখ করছি। সবচাইতে কার্যকর পন্থা হচ্ছে কুরআন তিলাওয়াত করা। এতে মনে হবে আমরা যেন একটি বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছি। কিন্তু মূলত তা নয়। কেননা, কুরআন পাঠ করলে আপনি নিশ্চিতভাবেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, এটা হচ্ছে আল্লাহর বাণী। আপনার বিশ্বাস তখন আরও গভীর এবং দৃঢ় হবে।

প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই যাদের অন্তর মহান রবের স্মরণের সময় কেঁপে ওঠে। আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় (আল আনফাল ঃ ২)।

নিয়তের পরিচ্ছন্নতা

দ্বিতীয়ত ঃ কুরআন পাঠ করুন কেবল আল্লাহর পথ নির্দেশ পাওয়া, তাঁর নৈকট্য লাভ এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।

আপনি কুরআন থেকে কি পেলেন তা নির্ভর করে আপনি কুরআন থেকে কি পেতে চান তার উপর। নিয়তই হচ্ছে এক্ষেত্রে চূড়ান্ত। নিঃসন্দেহে কুরআন এসেছে আমাদের হিদায়াতের জন্য। কিন্তু খারাপ উদ্দেশ্য এবং অসৎ অভিপ্রায় নিয়ে কুরআন পাঠ করলে আপনি বিপথগামী হতে পারেন। কুরআন হচ্ছে

আল্লাহর বাণী। সুতরাং আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীতে যে ধরনের নিয়তের পবিত্রতা এবং উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব প্রয়োজন কুরআন অধ্যয়নের জন্যও প্রয়োজন ঠিক সেই ধরনেরই উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব ও নিয়তের পবিত্রতা।

শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা ও আনন্দ লাভের জন্যই কুরআন অধ্যয়ন করবেন না। আপনার বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিপূর্ণভাবে কুরআন বুঝতে এবং তদনুযায়ী বাস্তবায়িত করার নিমিত্তে নিয়োজিত করুন। অনেকে কুরআনের ভাষা, এর ধরন, ইতিহাস, ভূগোল, আইন শাস্ত্র ও নীতি শাস্ত্র অধ্যয়নে জীবন শেষ করে দেয়। এতদ্সত্ত্বেও কুরআনের আসল বক্তব্যের নাগাল তারা পায় না বা কুরআনের মূলকথা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। কুরআন অনেক স্থানেই ঐসব লোকের কথা উল্লেখ করেছে, যাদের জ্ঞান আছে অথচ তা থেকে তারা উপকৃত হতে পারছে না।

নিজের মত, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের পক্ষে সমর্থন পাওয়ার নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কুরআন অধ্যয়ন করা উচিত নয়। সে অবস্থায় হয়তো আপনি নিজের কণ্ঠের প্রতিধ্বনিই শুনতে পাবেন, আল্লাহর নয়। কুরআন বুঝা ও ব্যাখ্যার এই পদ্ধতিকে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তীব্র নিন্দা করেছেন ঃ

যে ব্যক্তি নিজের মত অনুযায়ী কুরআন ব্যাখ্যা করবে, তার স্থান হবে জাহান্নামে (জামে আত্ তিরমিযী)।

দুনিয়াবী নাম, যশ, খ্যাতি ও অর্থলাভের জন্য কুরআনকে ব্যবহার করার মত দুর্ভাগ্যজনক আর কিছুই হতে পারে না। প্রভাব-প্রতিপত্তি, সুনাম, অর্থ-সম্পদ সবই আপনি পেতে পারেন। কিন্তু এতে অর্থহীনভাবে একটি অমূল্য সম্পদকে আপনি বিনিময় করে ফেলবেন। অবশ্যই আপনি অপরিসীম ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যদি কেউ জনগণের নিকট থেকে জীবিকা নির্বাহের জন্য কুরআন অধ্যয়ন করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার মুখ এমন হবে যেন একটি গোশতবিহীন হাড্ডি" (বায়হাকী)।

তিনি আরও বলেন ঃ

যে ব্যক্তি দুনিয়াবী কোন স্বার্থে কুরআন শিখে, আবৃত্তি করে বা শিক্ষা দেয়, তাকে জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে (সহীহ মুসলিম)।

কুরআনের বাণী থেকে ছোটখাট কতিপয় বিষয়ে আপনি উপকার পেতে পারেন, যেমন দৈহিক নিপীড়ন, মানসিক অশান্তি, দারিদ্র থেকে মুক্তি ইত্যাদি। এসব পাওয়ায় কোন বাধা নেই। কিন্তু এসবই আপনার কুরআন থেকে অর্জন করার জন্য সবকিছু হতে পারে না এবং এগুলো আপনার নিয়তেরও লক্ষ্য হতে পারে না। আপনি অবশ্য এসব অর্জন করতে পারেন। কিন্তু আপনি এক মহাসমুদ্র হারাবেন, যা আপনি পেতে পারতেন। কুরআনের প্রতিটি শব্দ পাঠের জন্য রয়েছে এক মহাপুরস্কার। প্রতিটি পুরস্কারের জন্য আপনাকে সজাগ থাকতে হবে এবং এটাকে আপনার নিয়তের অংশে পরিণত করুন। কেননা, সেগুলোই আপনাকে কুরআনের সাথে অতিবাহিত করতে অনুপ্রাণিত করবে। কিন্তু একথা কখনও ভুলবেন না যে, কুরআন বুঝা, আত্মস্থ করা এবং অনুসরণের জন্য আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাতে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এটাই হওয়া উচিত আপনার লক্ষ্য।

শুধু নিয়তের পরিচ্ছন্নতাই যথেষ্ট নয়। কুরআন এবং এর বাণীসমূহ ও এর জীবন্ত প্রতীক সুন্নাহ আপনার কাছে থাকা অবস্থায় কোনক্রমেই অন্য কিছুকে হিদায়াতের উৎস হিসেবে আপনি নিতে পারেন না। এরকম করার অর্থ হবে মরীচিকার পিছনে দৌড়ানো। তার অর্থই হবে কুরআনে আস্থার অভাব এবং কুরআনের অবমাননা। এটা হবে আনুগত্যের বিভক্তির শামিল।

আর কোন কিছু আপনাকে আপনার প্রভুর এত নিকটবর্তী করতে পারে না সেই সময় ব্যতীত যখন আপনি আপনার প্রভুর বাণীর সাথে অতিবাহিত করেন। কুরআন হচ্ছে আপনার জন্য সেই অপূর্ব নিয়ামত, যাতে আপনি আপনার উদ্দেশ্যে মহান প্রভুর 'কণ্ঠ' শুনতে পান। সুতরাং কুরআন অধ্যয়নকালে আপনার অন্তর্নিহিত কামনা হওয়া উচিত আল্লাহর নৈকট্য লাভ।

মহান আল্লাহ যে হিদায়াত আপনার প্রতি পাঠিয়েছেন তাতে হৃদয়, মন ও সময় উৎসর্গ করে আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবেন এই হওয়া উচিত আপনার নিয়তের লক্ষ্য। যার ভিত্তিতে আপনি আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করেন এটা হচ্ছে আপনার সেই চুক্তি। "মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে, যে কেবল আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবনপ্রাণ উৎসর্গ করে। বস্তুত আল্লাহ এইসব বান্দাহর প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল" (আল বাকারা ঃ ২০৭)।

উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় হচ্ছে দেহের প্রাণশক্তির মত, একটি বীজের অভ্যন্তরীণ শক্তির অনুরূপ। অনেক বীজ এক রকমই দেখায়। কিন্তু এগুলো যখন বাড়তে থাকে এবং বৃক্ষে পরিণত হয়ে ফল দেয়, তখনই তাদের পার্থক্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য যত পবিত্র ও উন্নত হবে আপনার পদক্ষেপ তত বড়, মূল্যবান ও ফলদায়ক হবে।

সুতরাং সর্বদাই আত্মপর্যালোচনা করুন এবং নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, কেন আমি কুরআন পড়ছি? অব্যাহতভাবে নিজেকে বলুন, কেন আপনার কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত। উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় পবিত্র রাখার এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং প্রশংসা

তৃতীয়ত ঃ মহান আল্লাহ তা'আলার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার সাথে এ ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার কুরআন দিয়েছেন আপনাকে এবং সেইসাথে কুরআন পাঠ ও অধ্যয়নের সুযোগও দান করেছেন তিনি।

একবার যদি আপনি অনুভব করতে পারেন কি এক অসাধারণ ও অমূল্য সম্পদ আপনার হাতে রয়েছে, তাহলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে, নেচে উঠবে এবং আপনি নিজেই বলে উঠবেন সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য, যিনি আমাদেরকে এই পথ দেখিয়েছেন। আমরা নিজেরা কিছুতেই পথ পেতে পারতাম না যদি আল্লাহই আমাদের পথ না দেখাতেন **(আল আরাফ ঃ ৪৩)।**

আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর যত রাহমাত ও আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন তার মধ্যে কোনোটির সাথেই কুরআনের তুলনা হয় না। আপনার শরীরের প্রতিটি চুল যদি জবান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে থাকে, যদি আপনার রক্তের প্রতি ফোটা আনন্দাশ্রুতে রূপান্তরিত হয়, তথাপি কুরআনের মহত্ত্বের সাথে আপনার প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা তুলনা হতে পারে না।

যদি কুরআন আমাদের উপর অবতীর্ণ নাও হতো, তথাপি কুরআনের পবিত্রতা,

সৌন্দর্য, মহানুভবতা এবং উজ্জ্বল দীপ্তি আমাদের সমস্ত প্রশংসার যোগ্য হতো। কিন্তু এই মহিমান্বিত ও পবিত্র দান আমাদের প্রভুর এক অসাধারণ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বাণী আমাদেরকে দেয়া হয়েছে কেবল আমাদের মুক্তির জন্য।

সে কারণে 'আল্লাহর প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া' জ্ঞাপন করা উচিত।

এমন গভীর প্রশংসা অনিবার্যভাবেই গভীর কৃতজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়। আল-হাম্‌দ শব্দটি যত ব্যাপক ও গভীরভাবে আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করতে সক্ষম, তা আর কোন শব্দ দিয়ে সম্ভব নয়। 'আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী হাদানা লিহাযা'-

আমাদেরকে কুরআন দান করার জন্য কেন আল্লাহর শুকরিয়া জানানো হবে? এইভাবে তিনি আমাদেরকে জীবনের উদ্দেশ্য ও অর্থ সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করেছেন। এই দুনিয়ার সম্মান ও গৌরবের কথা আপনার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এই কুরআনে আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারেন।

শুধু এ দুনিয়ার জীবনে কুরআনকে অনুসরণ করে আপনি ক্ষমা, জান্নাত এবং মহান আল্লাহর রেযামন্দি হাসিল করতে পারেন আখিরাতে। কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ নিয়ে যায় আস্থা, আশা এবং বড় পুরস্কারের দিকে। যিনি আপনাকে কুরআন দান করেছেন, তিনি অবশ্যই তা পড়তে, বুঝতে এবং অনুসরণ করতে আপনাকে সাহায্য করবেন। কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ এমন এক চির-সতেজ প্রাণশক্তি সৃষ্টি করে, যা আপনাকে সর্বদা নব উদ্দীপনায় কুরআন পাঠে সাহায্য করে। আপনি যত বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ততো বেশি কুরআনের সম্পদ দান করবেন। মহত্ত্ব কৃতজ্ঞতা আনে আর কৃতজ্ঞতা আপনাকে মহত করে তোলে এ হচ্ছে এক যতিহীন প্রক্রিয়া। আল্লাহর প্রতিশ্রুতিও তাই।

যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের আরো বেশি বেশি দান করবো (ইবরাহীম ঃ ৭)।

কুরআন পাওয়া সত্ত্বেও এর জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব না করার দুটো অর্থ

হতে পারে, হয় আপনি কুরআন যে আশীর্বাদ বহন করে এনেছে, সে সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা কুরআনের প্রতি আপনি কোন গুরুত্বই প্রদান করেননি। সর্বাবস্থায় এ ব্যাপারে আপনাকে অত্যন্ত গভীরভাবে ভাবতে হবে যে, কুরআনের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন? কৃতজ্ঞতার যে আবেগ আপনার হৃদয় ও মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত, তা অবশ্যই ভাষায় প্রকাশিত হতে হবে অবিরাম উচ্ছ্বসিতভাবে। আপনার চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন ও কুরআনের সাথে সময় পাওয়ার জন্য, শুদ্ধভাবে কুরআন পড়ার জন্য এ থেকে আপনার পাওয়া প্রতিটি অর্থের জন্য এবং কুরআন অনুসরণে সমর্থ লাভের জন্য। কৃতজ্ঞতাকে অবশ্যই কর্মে পরিণত করতে হবে।

স্বীকৃতি এবং আস্থা

চতুর্থত ঃ বিন্দুমাত্র সন্দেহ ও দোদুল্যমানতা ছাড়াই কুরআনের দেয়া প্রতিটি জ্ঞান এবং নির্দেশিকা গ্রহণ করুন ও আস্থা রাখুন।

এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর বাণী কিনা। এর দাবী প্রত্যাখানও করতে পারেন যদি আপনার পূর্ণ আস্থা না হয় বা প্রত্যয় না জন্মে। কিন্তু আপনি একবার আল্লাহর বাণী হিসেবে গ্রহণ করার পর এর একটি শব্দ সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করার কোন যৌক্তিকতা বা ভিত্তি নেই। এমন করার অর্থই হচ্ছে যা আপনি গ্রহণ করেছিলেন প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। কুরআনের শিক্ষার প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আপনার নিজস্ব বিশ্বাস, মতামত, রায়, দৃষ্টিভঙ্গি ও ঝোঁক-প্রবণতা যেন কুরআনের শিক্ষার কোন বিন্দুমাত্র অংশও অগ্রাহ্য করতে না পারে। কুরআন তাদের অপরাধী গণ্য করে, যারা কুরআনকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে এবং অতঃপর বিভ্রান্তি, হতবুদ্ধি ও সন্দেহপ্রবণ বিশ্বাসী হিসেবে আচরণ করে।

আর আসল কথা এই যে, আগের লোকদের পরে যাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে, তারা সেই ব্যাপারে বড় প্রাণান্তকর সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে (আশা শুরা ঃ ১৪)।

কুরআন এ ব্যাপারে বার বার জোর দিয়েছে যে, নির্ভেজালভাবে আল্লাহর বাণী প্রেরণ ও পৌঁছানোর নিশ্চিত করণার্থে যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বরং এই কুরআন অতীব উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ (আল বুরূজ ঃ ২১)।

এটি মূলতঃ এক সম্মানিত পয়গামবাহকের উক্তি, যে অত্যন্ত শক্তিশালী আরশের মালিকের নিকট উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। তথায় তার আদেশ মান্য করা হয়। সে আস্থাভাজন, বিশ্বস্ত (আত্ তাকভীর ঃ ১৯-২১)।

এটি সুসম্মানিত ও নেককার লেখকদের হাতে থাকে (আবাসা ঃ ১৫-১৬)। এরা সেই লোক, যাদের সামনে নসীহতের কালাম আসলে তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। কিন্তু আসল কথা এই যে, এটি একখানি বিরাট কিতাব। বাতিল না সামনের দিক থেকে এর উপর আসতে পারে, না পিছন থেকে। এটি এক মহাজ্ঞানী এবং সুপ্রশংসিত সত্তার নাযিল করা জিনিস (হামীম আস্ সাজদা ঃ ৪১-৪২)।

আরও ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

এই কুরআনকে আমরা সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি এবং সত্য সহকারেই এটি নাযিল হয়েছে (আল ইসরা ঃ ১০৫)।

তোমার প্রভুর বিধান সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণত (আল আনআম ঃ ১১৫)।

কুরআনকে সত্য এবং সম্পূর্ণ সত্য হিসেবে মেনে নেয়া এবং আস্থা স্থাপন করার অর্থ এ নয় যে, অন্ধবিশ্বাস, রুদ্ধ মানসিকতা বা অনুসন্ধানবিহীন উপলব্ধি। কুরআনে যা রয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার অনুসন্ধান, পর্যালোচনা, প্রশ্ন করা এবং বুঝার অধিকার রয়েছে। কিন্তু যা আপনি পুরোপুরি বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারেন না, তা অযৌক্তিক কিংবা অসত্য এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই। একটি মাইন যার প্রতিটি পাথরকণা অমূল্য রত্ন বলে আপনি বিশ্বাস করেন এবং এটা প্রমাণিত এসবের মধ্য থেকে যেগুলোর মূল্য আপনার চক্ষু নির্ধারণ

করতে পারে না অথবা আপনার কাছে যে যন্ত্র আছে তা নির্ধারণের জন্য, তার দ্বারা তা নির্ধারণ করাও সম্ভব নয়- এমতাবস্থায় আপনি ঐসব পাথরকণা ছুড়ে ফেলতে পারেন না।

কিংবা কুরআনের কোন অংশ পুরানো, সেকেলে, পুরানো কালের গল্প মনে করে বাদ দেয়ার কোন অবকাশ নেই। যদি আল্লাহ তা'আলা সর্বকালের প্রভু হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর বাণী চৌদ্দশ' বছর পরও সমানভাবে অকাট্য সিদ্ধ।

কুরআনের কিছু অংশ গ্রহণ করা এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করার অর্থ গোটা কুরআনকেই প্রত্যাখ্যান করা। কুরআনের সাথে আপনার সম্পর্কের প্রশ্নে আংশিকভাবে বা খণ্ডিতভাবে কুরআনকে গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই এবং এটা যুক্তিযুক্তও নয় (আল বাকারা ঃ ৮৫)।

হৃদয় ও মনে অনেক ব্যাধি রয়েছে, যা আপনাকে কুরআনের বাণী গ্রহণ করতে এবং তার প্রতি আত্মসমর্পণ করতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এ সবই কুরআনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে ঈর্ষা, কুসংস্কার, বাসনা চরিতার্থ করা এবং সমাজ প্রথা ও রীতির অন্ধ অনুকরণ। আপনার নিজস্ব মতামত পরিহার করতে, আল্লাহর কথা মেনে নিতে এবং বিনয়ের সাথে তা গ্রহণ করার পথে সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো অহংকার ও অজ্ঞতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার মনোভাব।

আমি সেই লোকদের দৃষ্টি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে ফিরিয়ে দিব, যারা কোন অধিকার ব্যতীতই যমীনের বুকে বড় মানুষী করে বেড়ায়। তারা যে নিদর্শনই দেখুক না কেন, তার প্রতি কখনও ঈমান আনবে না। সঠিক সরল পথ তাদের সামনে আসলেও তারা তা গ্রহণ করবে না। বাঁকাপথ দেখা দিলে তাকেই পথরূপে গ্রহণ করে চলবে। কেননা, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে এবং তাকে কিছুমাত্র পরোয়া করেনি (আল আরাফ ঃ ১৪৬)।

নিশ্চিতই জেনো, যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং এর মুকাবিলায় বিদ্রোহের নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য

আকাশ-জগতের দুয়ার কখনো খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততখানি অসম্ভব, যতখানি অসম্ভব সুঁচের ছিদ্র পথে উষ্ট্র গমন (আল আরাফ ঃ ৪০)।

আনুগত্য ও পরিবর্তন

পঞ্চমত ঃ জীবন, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহারে কুরআন যে পরিবর্তনই কামনা করে, তা মেনে নিতে দৃঢ় ইচ্ছা, সংকল্প এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আপনি যতক্ষণ কুরআনের বাণীর আলোকে আপনার চিন্তাধারা, কর্মকাণ্ড ঢেলে সাজাতে প্রস্তুত না হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিষ্ঠা এবং পরিশ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা এবং আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা কোন অবস্থাতেই আপনাকে কুরআনের সত্যিকারের সম্পদ ভাণ্ডারের নিকটবর্তী করতে পারবে না।

মানবিক দুর্বলতা, প্রলোভন, প্রাকৃতিক অসুবিধা, বাহ্যিক বাধা-বিপত্তির কারণে কুরআন মেনে চলা এবং সে অনুযায়ী জীবনে পরিবর্তন আনতে ব্যর্থতা এককথা, আর এজন্য কোন অভিপ্রায় না থাকা বা প্রচেষ্টা না চালানোর জন্য ব্যর্থতা সম্পূর্ণ ভিন্নকথা। এ অবস্থায় আপনি হয়তো বা কুরআনের একজন পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে পারেন, কিন্তু এটি কখনও আপনার কাছে প্রকৃত সত্য ও আসল অর্থ উদঘাটন করবে না। কুরআন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিয়েছে ঐসব লোকদের, যারা আল্লাহর এই কিতাবের উপর বিশ্বাসের দাবী করে অথচ তাদের যখন এটা মেনে চলতে বলা হয় অথবা যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আসে, তখন তারা কুরআনের আহ্বান অবহেলা করে। তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদেরকে আখ্যায়িত করা হয়েছে কাফির, ফাসিক ও যালিম বলে।

ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতা

ষষ্ঠত ঃ এ সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকুন যে, যেই আপনি কুরআন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করবেন শয়তান সম্ভাব্য সকল প্রকার বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করবে আপনার পথে, যাতে আপনি কুরআনের মহান সম্পদ লাভে সক্ষম না হন।

আল্লাহর সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে কুরআনই একমাত্র নিশ্চত গাইড। সেই পথে চলাই হচ্ছে মানুষের নিয়তি। যখন আদম (আ)কে সৃষ্টি করা হলো, তখন মানুষকে তার ভাগ্য পূরণে যেসব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হবে, সে

সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। মানুষের সকল দুর্বলতা বিশেষ করে ইচ্ছাশক্তি, সংকল্প এবং কৃতজ্ঞতাবোধের দুর্বলতা করে দেয়া হয়েছিল (তাহা ঃ ১১৫)

এটা সহজবোধ্য ও স্পষ্ট যে, কিভাবে শয়তান চলার পথে প্রতিটি পদে পদে বাধার সৃষ্টি করবে।

আমি অবশ্যই তোমার সত্য-সরল পথের এই লোকদের জন্য ওত পেতে থাকবো, অতঃপর সামনে ও পিছনে, ডানে ও বামে সকল দিক হতেই তাদেরকে ঘিরে ফেলবো এবং তুমি এদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না (আল আরাফ ঃ ১৬-১৭)।

কুরআন সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত এবং আপনার সবচাইতে শক্তিশালী মিত্র। শয়তানের বিরুদ্ধে এবং কুরআনের পথের সংগ্রামে আল্লাহর হিদায়াতের পথে বাঁচার সংগ্রামে এই কুরআনই আপনাকে সাহায্য করবে। সুতরাং আপনার কুরআন অধ্যয়নের সূচনা এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শয়তান অনেক কৌশল ও ছল-চাতুরী, মোহ ও প্রবঞ্চনা, বাধা ও বিপত্তিসহ আপনার মুখোমুখি হবে, যা আপনাকে অতিক্রম করতে হবে।

শয়তান আপনার অভিপ্রায়কে কলুষিত করতে পারে, কুরআনের অর্থ ও পয়গাম সম্পর্কে আপনাকে অমনোযাগী করে রাখতে পারে, আপনার আত্মা ও আল্লাহর ভুবনের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করাতে পারে, মূল শিক্ষার পরিবর্তে প্রান্তিক শিক্ষার ফাঁদে ফেলতে পারে, কুরআন মেনে চলা থেকে বিরত থাকতে আপনাকে প্রলুব্ধ করতে পারে অথবা সাধারণভাবে কুরআন অধ্যয়ন করার ব্যাপারে আপনাকে গাফিল করে তুলতে পারে। এই সবগুলো বিপত্তি সম্পর্কেও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে কুরআনেই।

খুব সাধারণ একটি জিনিসের কথাই ধরা যাক। প্রতিদিন কুরআন অধ্যয়ন করে তা বুঝলে খুবই সহজ মনে হয়। কিন্তু চেষ্টা করুন এবং দেখবেন কত কঠিন মনে হয়। সময় চলে যায়, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে হাযির হয়। কেন্দ্রীভূত

মন ও মনোযোগ তাই হয় যা আপনি এড়াতে চান, কেন দ্রুত শুধু বরকতের জন্য পড়েন না। এই বিপদ থেকে সতর্ক থাকার জন্য যখন আপনি কুরআন পড়েন, তখন কুরআনের অনুগত হয়ে বিভ্রান্ত ও প্রত্যাখ্যাত শয়তানের হাত থেকে আল্লাহর নিকট পানা চান (আন নহল ঃ ৯৮)।

বলুন– আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম।

আস্থা ও নির্ভরতা

সপ্তমত ঃ আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখুন যেন তিনি আপনাকে কুরআন পাঠের পুরো ফায়দার দিকে পরিচালিত করেন।

এটা আল্লাহর অসীম মেহেরবাণী, যে কুরআন আল্লাহর কথাকে আপনার নিকট এনেছে এবং আপনাকে তাঁর নিকট নিয়েছে। সুতরাং আল্লাহর দয়াই আপনাকে সংকটজনক কাজে সাহায্য করতে পারে। আপনার দরকার গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান প্রতিবিধান, যা সহজে লাভ করা যায় না। আপনাকে কঠিন বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। যা অতিক্রম করা সহজ নয়। আল্লাহ ছাড়া আর কার দিকে আপনি তাকাতে পারেন, যিনি আপনার হাত ধরে সাহায্য করবেন এবং আপনার চলার পথের নির্দেশনা দিবেন?

আপনার ইচ্ছা এবং পদক্ষেপই হচ্ছে অত্যাবশ্যক মাধ্যম। কিন্তু আল্লাহর অসাধারণ দয়া এবং সমর্থনই একমাত্র গ্যারান্টি, যার সাহায্যে আপনি সাফল্যের সাথে আপনার পথ চলতে সক্ষম হবেন। আপনার জীবনের সবকিছুর জন্য শুধু তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। আর কুরআনের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আর কি থাকতে পারে?

আপনি কুরআনের জন্য যা করছেন এবং যা অজর্ন করতে পেরেছেন, সে সম্পর্কে কখনো গর্ব প্রকাশ করবেন না। সে কাজের যখন কোন তুলনা হয় না, যা আপনার কমতি এবং সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে সর্বদা সজাগ রাখে।

সুতরাং বিনয়ের সাথে কুরআনের নিকট আবেদন করুন, আল্লাহর প্রতি পরম নির্ভরতার জযবা নিয়ে প্রতিপদে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন চান।

বিশ্বাস, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার মানসিকতা নিয়ে আপনার ভাষা ও হৃদয়ের

পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে তিলাওয়াত শুরু করুন- 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে। এই আয়াতটুকু কুরআনের ১১৪টি সূরার একটি মাত্র সূরা ব্যতীত প্রতিটির সূচনাতেই বিদ্যমান। বান্দাহ তাঁর নিরাপত্তা চেয়ে প্রার্থনা করছে ঃ হে আল্লাহ! তুমি যখন আমাদের সঠিক সোজা পথ দেখিয়েছ, তখন তুমি আমাদের মনে কোন রকম বক্রতা ও জটিলতা সৃষ্টি করে দিও না। আমাদেরকে তোমার মেহেরবাণীর ভাণ্ডার থেকে অনুগ্রহ দান কর, কেননা প্রকৃত দাতা তুমিই (আলে ইমরান ঃ ৮)। ■

৩ ঃ আন্তরিক মনোনিবেশ

কুরআন তিলাওয়াতে, অধ্যয়নে আপনাকে আপনার গোটা দেহ ও মন দিয়ে পুরোপুরিভাবে জড়িত হতে হবে। কেবল এভাবেই আপনি আপনার সত্তাকে উন্নীত করতে পারেন কুরআনের কাংখিত স্তরে, যেখানে পৌঁছলে আপনাকে সত্যিকারের বিশ্বাসী বলে অভিহিত করা হবে।

আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথোপযুক্তভাবে পড়ে, তারা তার প্রতি নিষ্ঠাসহকারে ঈমান আনে। তার প্রতি যারা কুফরী করে, মূলত ঃ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় (আল বাকারা ঃ ১২১)।

হৃদয় কি ?

আপনার ব্যক্তিসত্তার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে আপনার অন্তরাত্মা। এই অন্তরাত্মাকেই কুরআন বলেছে 'কলব' বা হৃদয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হৃদয়ই হচ্ছে কুরআনের বাণীর প্রথম গ্রহীতা।

এটি হচ্ছে রাব্বুল আলামীনের নাযিল করা জিনিস। একে নিয়ে তোমার দিলে আমানতদার 'রূহ' অবতরণ করেছে, যেন তুমি সেই লোকদের মধ্যে শামিল হতে পার যারা (আল্লাহর তরফ হতে সব লোকের জন্য) সাবধানকারী (শুয়ারা ঃ ১৯২-৪)।

সুতরাং তখনই আপনি কুরআন পাঠের পুরো আনন্দ ও আশীর্বাদ ভোগ করতে পারেন, যখন আপনি আপনার দিলকে পরিপূর্ণরূপে এ কাজে নিয়োজিত করতে পারেন।

'হৃদয়' কুরআনের পরিভাষায় আপনার দেহের মাত্র একটি মাংসপিণ্ড নয়। বরং হৃদয় হচ্ছে আপনার যাবতীয় আবেগ, অনুভূতি, উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা, স্মৃতি ও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু।

এ হচ্ছে সেই হৃদয় যা বিচলিত হয় (আয্ যুমার ঃ ২৩), অথবা কঠিন এবং শক্ত হয় (আল বাকারা ঃ ৭৪), যা অন্ধ হয় এবং সত্য প্রত্যাখ্যান করে (আল আরাফ

ঃ ১৭৯), আল হাজ্জ ঃ ৪৬, কাফ ঃ ৩৭)। এই হৃদয়ই হচ্ছে সমস্ত প্রকার ব্যাধির উৎস (আল মায়িদা ঃ ৩২), এ হচ্ছে সমস্ত অভ্যন্তরীণ ব্যাধির আশ্রয়স্থল (আল বাকারা ঃ ১০), হৃদয় হচ্ছে সকল ঈমান এবং মুনাফিকীর আবাসস্থল (আল মায়িদা ঃ ৪১, আত্ তাওবা ঃ ৭৭), হৃদয় হচ্ছে সকল ভালো ও মন্দের কেন্দ্রস্থল, সেটা তৃপ্তিই হোক আর প্রশান্তিই হোক (আর রাদ ঃ ১৮), যন্ত্রণা মুকাবিলায় শক্তিই হোক (আত্ তাগাবুন ঃ ১১), আর ক্ষমা (আল হাদীদ ঃ ২৭), ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসা (আল আনফাল ঃ ৬৩), তাকওয়া হোক (আল হুজুরাত ঃ ৩, আল হাজ্জ ঃ ৩২), অথবা সন্দেহ ও দোদুল্যমানতা (আত্ তাওবা ঃ ৪৫), অনুতাপ (আলে ইমরান ঃ ১৫৬) ও ক্রোধই হোক (আত্ তাওবা ঃ ১৫)।

চূড়ান্তভাবে বাস্তবে হৃদয়ের আচরণের জন্যই আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে এবং একমাত্র সেই ব্যক্তি রক্ষা পাবে, যে তার প্রভুর সামনে একটি সুস্থ হৃদয় নিয়ে হাযির হতে পারবে।

যেসব প্রতিজ্ঞা তোমরা বিনা ইচ্ছায়ই করে ফেল, সেজন্য আল্লাহ্ তোমাদের শাস্তি দান করবেন না। কিন্তু যেসব প্রতিজ্ঞা তোমরা আন্তরিকতার সাথে করে থাক, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন (আল বাকারা ঃ ২২৫)। সেই দিন না ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে, না সন্তান-সন্ততি। কেবল সেই ব্যক্তি উপকৃত হবে, যে প্রশান্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে হাযির হবে (আশ শূরা ঃ ৮৮-৮৯)।

অতএব আপনাকে এটা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, যতক্ষণ আপনি কুরআনের সাথে আছেন আপনার হৃদয় আপনার সাথে আছে, কোন মাংসপিণ্ড নয় বরং কুরআন যাকে বলেছে 'কলব'।

এটা কঠিন বলে প্রতীয়মান হবে না যদি কিছু ব্যাপারে আপনি সচেতন হন এবং হৃদয় ও দেহের কতিপয় ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত সাতটি পূর্বশর্ত কুরআন অধ্যয়নে আপনার হৃদয়ে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণের ভিত্তি রচনা করে। এর সাথে আরও কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আপনার হৃদয়কে অধিকতর গভীরভাবে এবং ব্যাপকভাবে এ কাজে নিয়োজিত করা সম্ভব হবে।

আন্তরিক মনোনিবেশের গতিশীলতা

আন্তরিক মনোনিবেশের গতিশীলতা আপনাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। আপনার অন্তরে সত্যের কতটুকু দখল আছে? প্রথমে আপনি সত্যকে জানুন। দ্বিতীয়ত, সত্যকে সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দিন এবং গ্রহণ করুন আপনার জীবনের মত। তৃতীয়ত, সত্যকে স্মরণ করুন যতবার আপনি পারেন। চতুর্থত, আপনি এটা আত্মস্থ করুন যতক্ষণ তা আপনার অন্তরের গভীরতম কোণকে সিক্ত না করে। এই ভাবে সত্য আপনার হৃদয়ের এক স্থায়ী মেযাজ ও চিরঞ্জীব সচেতনতায় পরিণত হয়। একবার সত্য আপনার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করলে তা অবশ্যই কথা এবং কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবে।

এখানে এটা মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, যা আপনি জিহ্বা ও অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা বাহ্যিকভাবে করেন, তা আপনার অভ্যন্তরীণ কর্মেরই প্রতিক্রিয়া। এটা সম্ভব যে, কথা ও কাজ অভ্যন্তরীণ অবস্থার মিথ্যা সাক্ষ্য হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসের মত একটি অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রকাশ নিশ্চিতভাবেই কথা ও কাজের মধ্যে প্রকাশ পাবে, যা পর্যায়ক্রমে আপনার বিবেকে জ্ঞানছাপ দিতে সাহায্য করবে এবং এটাকে একটি স্থায়ী শর্তে পরিণত করবে।

এখানে যেসব পরামর্শ দেয়া হলো, তা কার্যকর হবে যদি আপনি উপরের আলোচিত গতিশীলতা সম্পর্কে মনোযোগী হন এবং উল্লেখিত মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করেন।

সচেতনতার অবস্থা

সচেতনতার সাতটি অবস্থা রয়েছে। কিছু বিষয় স্মরণ রেখে আত্মস্থ করে এবং নিজেকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আপনাকে চেষ্টা চালাতে হবে।

আন্তরিক অংশগ্রহণের কুরআনিক মানদণ্ড

প্রথম ঃ নিজেকেই বলুন, আমার কুরআন পাঠ সত্যিকারের তিলাওয়াত হবে না যতক্ষণ আমার অন্তরাত্মা আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবে এতে মনোনিবেশ না করছে। আল্লাহ কি চান? কিভাবে কুরআনকে আপনার গ্রহণ করা উচিত?

কুরআন নিজেই অনেক জায়গায় আপনাকে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে কিভাবে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর সাহাবাগণ এবং ঐ সব ব্যক্তি যাদের হৃদয় কুরআন দ্বারা সিক্ত ছিল কুরআনকে গ্রহণ করেছিলেন। কুরআনের এই ধরনের আয়াতগুলো আপনার স্মরণ করা উচিত এবং অতঃপর আপনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করেন, তখন আপনার উপর ঐ সব আয়াতের প্রতিফলন হওয়া উচিত। ঐ সব আয়াতের কথাগুলো হলো ঃ

প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণকালে কেঁপে ওঠে। আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের আল্লাহর উপর আস্থা ও নির্ভরতা রাখে (আল আনফাল ঃ ২)। আল্লাহ অতি উত্তম কালাম নাযিল করেছেন। এটি এমন এক কিতাব যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যাতে বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তা শুনে তাদের গায়ে লোমহর্ষণ দেখা দেয়। যারা নিজেদের আল্লাহকে ভয় করে। পরে তাদের দেহ ও তাদের দিল নরম হয়ে আল্লাহর স্মরণে উৎসাহী ও উৎসুক হয়ে ওঠে। এটি আল্লাহর হিদায়াত, এর দ্বারা তিনি হিদায়াতের পথে নিয়ে আসেন যাকে তিনি চান। আর আল্লাহই যাকে হিদায়াত না করেন, তার জন্য হিদায়াতকারী কেউ নেই (আয্ যুমার ঃ ২৩)।

হে মুহাম্মাদ, এই লোকদেরকে বল যে, তোমরা একে মেনে নাও বা না মান যেসব লোককে ইতিপূর্বে ইল্‌ম দেয়া হয়েছে, তাদেরকে যখন এটি শুনানো হয়, তখন তারা নতমুখে সিজদায় পড়ে যায়। আর এই বলে চিৎকার করে ওঠে, "পবিত্র আমাদের আল্লাহ, তাঁর ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে।" আর তারা কাঁদতে কাঁদতে নতমুখে পড়ে যায়, আর তা শুনতে পাওয়ায় তাদের নিবিড় আনুগত্য আরও বৃদ্ধি পায় (আলে ইমরান ঃ ১০৭-১০৯)।

তাদের অবস্থা এই ছিল যে, পরম করুণাময়ের আয়াত যখন তাদের শুনানো হতো, তখন কাঁদতে কাঁদতে তারা সিজদায় পড়ে যেত (মরিয়ম ঃ ৫৮)।

যখন তারা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বাণী শুনতে পায়, তখন তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যকে জানা ও চেনার প্রভাবে তাদের চক্ষুসমূহ অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে

যায়। তারা বলে ওঠে, হে আমাদের প্রভু, আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের নাম সাক্ষীদাতাদের সংগে লিখে দাও (আল মায়িদা ঃ ৮৩)।

আল্লাহর উপস্থিতি

দ্বিতীয় ঃ নিজেকে বলুন, আমি আল্লাহর সামনে হাযির, আল্লাহর উপস্থিতির মধ্যে। তিনি আমাকে দেখছেন।

এ বাস্তবতার প্রতি আপনাকে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে যে, যখনই আপনি কুরআন অধ্যয়ন করছেন, তখন তাঁর উপস্থিতির মধ্যেই রয়েছেন, যিনি ঐ বাণী আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। কেননা আল্লাহ সর্বাবস্থায় আপনার সাথেই আছেন, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, যাই করুন না কেন, তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী।

এই পর্যায়ে সচেতনতা কিভাবে অর্জন করা যায়? এ সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে কি বলেছেন শুনুন। কুরআন অধ্যয়নের শুরুতে ও অধ্যয়নকালে ঐ সব আয়াত স্মরণ করুন, মনোযোগী হন এবং গভীরভাবে বিবেচনা করুন। শুধু কুরআন অধ্যয়নে নয়, বরং সারা জীবন কুরআন অনুযায়ী অতিবাহিত করতে আরও বেশি যা সাহায্য করতে পারে তা হলো এ বাস্তবতাকে স্মরণ করা এবং গভীরভাবে বিবেচনা করা, যতটা বেশি বেশি পারা যায়। একাকী অথবা সমষ্টিগতভাবে, নীরবে অথবা সরবে ঘরে অথবা কার্যক্ষেত্রে, বিশ্রামে অথবা ব্যস্ততায় বলুন, মনে মনে অথবা উচ্চস্বরে– তিনি এখানে, তিনি আমার সাথে, তিনি দেখছেন, শুনছেন, জানছেন এবং হিসাব রাখছেন। আর এই আয়াতসমূহ স্মরণ করুন ঃ

তিনি তোমাদের সংগে আছেন, যেখানেই তোমরা থাক, যে কাজই তোমরা কর তা তিনি দেখছেন (আল হাদীদ ঃ ৪)।

আমরা তার গলার শিরা থেকেও অধিক নিকটবর্তী (কাফ ঃ ১৬)।

এমন কখনও হয় না যে, তিনজন লোকের মধ্যে কোন কান পরামর্শ হবে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহ চতুর্থ হবেন না, কিংবা পাঁচজনের কান পরামর্শ হবে আর আল্লাহ তাদের মধ্যে ষষ্ঠ হবেন না। গোপন পরামর্শকারীরা এর কম হোক কি বেশি যেখানেই তারা হবে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সংগে থাকবেন (আল মুজাদালা ঃ ৭)।

আমি তোমাদের দু'জনের (মূসা ও হারূন) সংগে আছি, সবকিছুই শুনছি এবং দেখছি (তাহা ঃ ৪৬)।

নিঃসন্দেহে তুমি আমাদের দৃষ্টিপথে রয়েছ (আত্ তূর ঃ ৪৮)।

আমরা নিশ্চিতই একদিন মৃতদের জীবিত করবো, তারা যেসব কাজ করছে তার সবই আমরা লিখে যাচ্ছি। আর যা কিছু নিদর্শন তারা পিছনে রেখে যাচ্ছে, তাও আমরা সুরক্ষিত করে রাখছি। প্রত্যেকটি জিনিসই আমরা একটি উন্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রাখছি (ইয়াসীন ঃ ১২)।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াত। এ আয়াতে শুধু জোর দিয়ে এ কথাই বলা হয়নি যে, আল্লাহ সর্বত্র হাযির থাকেন, সবকিছু দেখেন বরং কুরআন অধ্যয়ন সম্পর্কেও নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন এবং কুরআন থেকে যা কিছু শোনাও আর হে লোকেরা, তোমরা যা কিছু কর এই সব অবস্থাতেই আমরা তোমাদের দেখতে ও লক্ষ্য করতে থাকি। আসমান-যমীনে একবিন্দু পরিমাণ জিনিস এমন নাই– না ছোট, না বড়- যা তোমার আল্লাহর দৃষ্টি হতে লুকিয়ে রয়েছে এবং এক পরিচ্ছন্ন খাতায় লিপিবদ্ধ নয় (ইউনুস ঃ ৬১)।

সুতরাং আল্লাহ নিজে আমাদেরকে বলছেন- আমি উপস্থিত থাকি যখন তোমরা কুরআন পাঠ কর, কখনো একথা ভুলবে না।

কুরআন তিলাওয়াত করা হচ্ছে একটি ইবাদাত। সর্বোচ্চ উৎকর্ষ লাভের উপায়ই হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত করা। এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ

আল্লাহর ইবাদাত হচ্ছে যেন তুমি আল্লাহকে দর্শন করছ, যদিও তোমার চোখ আল্লাহকে দেখতে পায় না, তুমি দেখতে পাও না যে, তিনি তোমাকে দেখছেন (সহীহ মুসলিম)।

উপরন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, কেবল তুমিই তাঁর উপস্থিতির মধ্যে নও, তিনি তোমাকে স্মরণ করেন যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকো।

আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাকে স্মরণ করবো (আল বাকারা ঃ ১৫২)। নিঃসন্দেহে আল্লাহর স্মরণ বা যিকরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআন তিলাওয়াত করা।

আল্লাহর নিকট থেকে শ্রবণ করা

তৃতীয় ঃ নিজেকে বলুন, আমি আল্লাহর নিকট থেকে শ্রবণ করছি।

আপনার অন্তরাত্মাকে কুরআন অধ্যয়নে নিয়োজিত করার অংশ হিসেবে আপনার এটা ভাবতে চেষ্টা করা উচিত যেন কুরআন আপনি শুনছেন আল্লাহর নিকট থেকে। কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'আলার অভিভাষণ। কেননা আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না যখন তিনি আপনার সাথেই রয়েছেন, আপনি তাঁর কথাও শুনতে পাচ্ছেন না যিনি এ ভাষণ দিয়েছেন। ছাপার অক্ষরের কথাগুলো এবং তিলাওয়াতকারীর কণ্ঠস্বর অপসৃত হতে দিন এবং বক্তার আরও নিকটবর্তী হন। এই অনুভূতি আপনার মধ্যে আল্লাহর উপস্থিতির চেতনাকে আরও মযবুত ও শক্তিশালী করবে।

ইমাম গাযযালী (রহ) তাঁর গ্রন্থ ইহ্ইয়ায়ে উলুমিদ্দীন-এ এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, আমি কুরআন পাঠ করি কিন্তু এতে কোন মজা পাই না। এরপর আমি এমনভাবে পড়ি যেন আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে শুনছি যখন তিনি তাঁর সাহাবাদের তিলাওয়াত করে শুনাচ্ছিলেন। অতঃপর আমি একধাপ অগ্রসর হলাম এবং কুরআন এমনভাবে পড়লাম যেন জিবরাঈল (আ)-এর নিকট থেকে শুনছি- যখন তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছাচ্ছিলেন। পুনরায় আমি আল্লাহর মেহেরবাণীতে আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে এমনভাবে পড়তে শুরু করলাম যেন আমি মহান আল্লাহর নিকট থেকেই তা শ্রবণ করছি।

এই ধরনের উপলব্ধি আপনাকে সিক্ত করবে আনন্দ ও তৃপ্তিতে, যা আপনার অন্তরাত্মাকে আচ্ছাদিত করবে কুরআন দিয়ে।

আল্লাহর সরাসরি ভাষণ

চতুর্থ ঃ নিজেকে বলুন, যখন আমি কুরআন পড়ি, আল্লাহ বাণীবাহকের মাধ্যমে সরাসরি আমাকে বলছেন।

নিঃসন্দেহে ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়ে কুরআন নাযিল করা হয় এবং এটি আপনি পরোক্ষভাবে বিশেষ সময়ের ব্যক্তি থেকে পেয়েছেন। কিন্তু কুরআন হচ্ছে চিরঞ্জীব আল্লাহর বাণী। এটা সর্বকালের জন্য। এর আবেদন প্রতিটি মানুষের কাছে। অতএব এসব মধ্যবর্তীদের কিছু সময়ের জন্য বাদ দিয়ে নিজেই কুরআন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করুন এমনভাবে যেন কুরআন সরাসরি আপনার সাথে কথা বলছে, আপনার কালের একজন ব্যক্তি হিসেবে বা একটি সমষ্টির সদস্য হিসেবে। এভাবে সরাসরি কুরআন গ্রহণের কথা চিন্তায়ই আপনার হৃদয় জুড়ে কুরআনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রতিটি শব্দ আপনার জন্য

পঞ্চম ঃ বলুন, কুরআনের প্রতিটি শব্দ আমার জন্য।

কুরআন যদি অনন্তকালের জন্যই সিদ্ধ হয় এবং যদি আজকের দিনে আপনার প্রতি লক্ষ্য করে কথা বলে আপনাদের এর প্রতিটি বাণীকে এভাবেই নিতে হবে যে, তা আপনার জীবনের সাথে সম্পর্কিত চাই সেটা কোন মূল্যবোধ বা নীতির কথাই হোক, অথবা জ্ঞানের কোন বিবৃতি হোক, কোন চরিত্র বা সংলাপ, প্রতিশ্রুতি বা সতর্কতা আদেশ বা নিষেধই হোক।

বিষয়টির এমন উপলব্ধি আপনার কুরআন অধ্যয়নকে জীবন্ত, গতিশীল অর্থবহ করে তুলবে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যেহেতু ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে, তাই একজনকে উদ্দেশ্য করে প্রদত্ত পয়গাম অন্য জনের জন্য রূপান্তরিত করতে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে আন্তরিক ও সঠিক প্রচেষ্টা চালালে এটা সম্ভব।

আল্লাহর সাথে আলাপ

ষষ্ঠ ঃ নিজেকেই বলুন, আমি যখন কুরআন পড়ছি, তখন আল্লাহর সাথেই কথা বলছি।

কুরআনে রয়েছে, আল্লাহর কথা আপনার উদ্দেশ্যে, আপনার জন্য নিবেদিত। যদিও বা ঐসব শব্দ আপনাদের ঠোঁটে এবং আপনাদের হৃদয়ে অংকিত রয়েছে, তথাপি ঐটি হচ্ছে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার সংলাপ। এ সংলাপ অনেক রূপ নিতে পারে। এটা সুস্পষ্টভাবেও বর্ণিত হতে পারে আবার অন্তর্নিহিতভাবেও

হতে পারে, এই অর্থে যে, আপনার বা তাঁর দিক থেকে সাড়া দানের ব্যাপারটা এর মধ্যে রয়ে গেছে।

এই অন্তর্নিহিত আলোচনা বা সংলাপ কিভাবে হয়ে থাকে? এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসে কুদসীতে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ঃ

"আমি নামাযকে ভাগ করেছি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে। অর্ধেক আমার, অর্ধেক তার এবং আমার বান্দা যা চাবে তা পাবে। এজন্যই যখন বান্দা বলে, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য- আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে প্রশংসিত করেছে। বান্দা যখন বলে, আর রাহমানির রাহীম- পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে উচ্চ প্রশংসায় ভূষিত করেছে। যখন বান্দা বলে, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন- বিচারের দিনের প্রভু আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে মহিমান্বিত করেছে, এটা আমার অংশ। যখন সে বলে, ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন- আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি- তখন তিনি বলেন, এটাই আমার ও আমার বান্দার মধ্যে ভাগ হয়েছে। তাকে তাই দেয়া হবে যা সে চাবে। যখন সে বলে, ইহ্দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম- আমাদের সহজ সরল পথ দেখাও- আল্লাহ বলেন, এটা আমার বান্দার, আমার বান্দা যা চায়, তা সে পাবে (সহীহ মুসলিম, জামে আত্ তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

পরবর্তী সময়ে আপনারা দেখবেন যে, কিভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বাণী ও তাঁর বিভিন্ন আয়াতের বিষয়বস্তুর প্রতি সাড়া দিতেন, স্রষ্টা এবং প্রভুর সাথে আলাপ করতেন, কথা বলতেন। এই সচেতনতা আপনার কুরআন অধ্যয়নে এক অসাধারণ গভীরতা ও ঐকান্তিকতা সৃষ্টি করবে।

আল্লাহর পুরস্কারের আশা পোষণ করা

সপ্তম ঃ নিজেকে বলুন, আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে কুরআন অধ্যয়ন এবং তা অনুসরণ করার জন্য যত পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন নিশ্চিতভাবে তিনি আমাকে তা দিবেন।

কুরআনে অনেক পুরস্কারের ওয়াদা করা হয়েছে। নিশ্চিত করা হয়েছে জীবনের আত্মিক গুণাবলী। যেমন ঃ পথ-নির্দেশনা, ক্ষমা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, স্বস্তি, স্মৃতি এবং দৃষ্টিশক্তি। অনুরূপভাবে দুনিয়ার জীবনে সম্মান ও মর্যাদা, সচ্ছলতা এবং উন্নতি, সাফল্য ও বিজয়। শাশ্বত আশীর্বাদ- যেমন ক্ষমাশীলতা (মাগফিরাত), জান্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি (রিদওয়ান) ও মওজুদ রয়েছে কুরআনের অনুসারীদের জন্য।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও অনেক পুরস্কারের কথা বলেছেন। যে কোন প্রামাণ্য হাদীস সংকলন যেমন সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত অথবা রিয়াদুস সালিহীনে কুরআন সম্পর্কিত অধ্যায় পাঠ করলে আপনি তা পাবেন। এই বইতেও কিছু পাবেন, বিশেষ করে শেষ দিকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ–

তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে কুরআন শিখে এবং শিক্ষা দেয় (সহীহ আল বুখারী)।

কুরআন পাঠ করো, কেননা কিয়ামতের দিনে কুরআন তার সংগীর জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে (সহীহ মুসলিম)।

কোন সুপারিশকারী কুরআনের মত মর্যাদা রাখে না (শারহিল ইয়াহ্ইয়া) কিয়ামতের দিন কুরআনের সংগীকে কুরআন পড়তে এবং উর্ধ্বে উঠতে বলা হবে। যে যত পড়বে তত উর্ধ্বে উঠতে থাকবে (সুনান আবু দাউদ)।

কুরআনের পঠিত প্রতিটি অক্ষরের জন্য তুমি দশগুণ পুরস্কার পাবে (জামে আত্ তিরমিযী)।

এ ওয়াদাগুলো আপনি জমা করতে থাকুন যতটা আপনার স্মৃতিশক্তি পারে এবং স্মরণ করুন যা আপনি পারেন এবং যখনই পারেন। আল্লাহর উপর আস্থা রাখুন, আশা করুন এবং চান।

এ পরিমাণ মেনে চলা যা হাদীসে ঈমান ও ইহতিসাব বলা হয়েছে, আপনার কর্মের অভ্যন্তরীণ মূল্যমান অনেক বাড়িয়ে দিবে। এক হাদীসে বলা হয়েছে -

চল্লিশটি সওয়াবের কাজ আছে, তার মধ্যে কেউ যদি আল্লাহর ওয়াদার উপর

আস্থা ও পুরস্কারের আশা নিয়ে একটিও সম্পাদন করে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। এ সওয়াবের কাজের মধ্যে সর্বোচ্চটি হলো এত ক্ষুদ্র যেমন কেউ তার প্রতিবেশীকে সামান্য দুধ উপহার দিল (সহীহ আল বুখারী)।

দেহ এবং আত্মার ক্রিয়া

দেহ ও আত্মার সাতটি ক্রিয়া আছে, যা আপনাকে আপনার অন্তরকে গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে বিরাট রকম সাহায্য করবে। এর কতক ক্রিয়া এমন আছে যা আপনি ইতোমধ্যেই করছেন। কিন্তু তা থেকে আপনি পুরোপুরি ফল লাভ করতে পারছেন না হয়তো বা এ কারণে যে, আপনি তা সঠিকভাবে করছেন না, বা তার মাধ্যমে যা অবশ্যই অর্জন করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে আপনি সজাগ নন। আর এমন কতক ক্রিয়া রয়েছে, যা আপনি আগে কখনও উপলব্ধি করেননি। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন অধ্যয়নের জন্য এগুলো আপনাকে জানতে হবে এবং শিখতে হবে।

উল্লিখিত কাজ বা ক্রিয়া সম্পাদনে আপনি বর্তমানে কুরআন অধ্যয়নে যে সময় দিচ্ছেন তার চাইতে কোনক্রমেই বেশি সময় লাগবে না। এসব ক্রিয়া (এ্যাকশন) আপনার কাছে যা চায় তা হলো অধিকতর মনোযোগ, গভীর একাগ্রতা এবং সঠিক ও কার্যকরভাবে অধ্যয়নের সচেতনতা।

আত্মার সাড়া

প্রথম ঃ কুরআন যাই বলে না কেন সে সম্পর্কে আত্মাকে সজীব ও সজাগ করতে হবে।

প্রতিটি বিষয় যা কুরআনে আপনি পাঠ করেন, তাকে আপনার অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে দিন এবং তাতে নবজীবন সঞ্চারিত করতে দিন। আপনার হৃদয়কে ভক্তি ও প্রশংসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা, বিস্ময় ও আতংক, ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও ধৈর্য, আশা ও ভয়, আনন্দ ও বেদনা, অভিব্যক্তি ও অনুসৃতি, আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য অনুরূপ নানাবিধ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে দিন। আপনি যতক্ষণ তা না করেন, কুরআন অধ্যয়ন থেকে যে ফায়দা আপনি আহরণ করতে চান তা মুখ নাড়ানোর চাইতে বেশি কিছু হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ যখন আপনি আপনার প্রভুর নাম ও গুণাবলী শ্রবণ করবেন,

তখন শংকা, কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা ও অন্যান্য যথাযথ অনুভূতিতে হৃদয় ভরে যাওয়া উচিত। যখন আপনি আল্লাহর নবী-রাসূলদের কথা পাঠ করেন, তখন তাঁদের অনুসরণ করার এক তীব্র অনুভূতি আপনার মধ্যে জাগ্রত হওয়া উচিত এবং যারা তাঁদের বিরোধিতা করেছে, তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিরূপতা সৃষ্টি হওয়া উচিত। যখন আপনি শেষ বিচারে দিনের কথা পাঠ করেন, তখন আপনার অন্তরে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া এবং মুহূর্তের জন্য হলেও জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার ভয়ে আপনার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠা উচিত। অবাধ্য ব্যক্তি ও জাতিসমূহ যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং শাস্তি পেয়েছিল, তাদের কথা যখন পাঠ করেন, তখন তাদের মত হওয়াটাকে আপনার অপছন্দ করা উচিত। আর যখন সৎ পথের অনুসারীদের কথা পড়েন, যাদের আল্লাহ ভালোবাসেন, পুরস্কৃত করেন, আপনারও তাঁদের মত হওয়ার জন্য উদগ্রীব হওয়া উচিত।

যখন আপনি আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া এবং দুনিয়ায় সম্মান ও প্রাচুর্য, আখিরাতে তাঁর সন্তোষ ও নৈকট্য লাভের কথা পড়েন, তা পাওয়ার ব্যাকুলতায় তার জন্য কাজ করতে ও তার যোগ্য হতে আপনার অন্তরেও উদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়া উচিত। আর যখন ঐসব হতভাগাদের কথা পড়বেন, যারা কুরআন থেকে গাফিল, যারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যারা কুরআনকে গ্রহণ করে না, কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করে না, তখন আপনার ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া উচিত। আপনি যেন তাদের একজন না হন এবং স্থির সংকল্প নিন তা না হতে। আপনি যখন আল্লাহর নিকট আপনার প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং তার পথে সংগ্রাম করার আহ্বান শুনতে পান, তখন আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য নতুন করে সংকল্প গ্রহণ করা উচিত এবং সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর পথে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।

কোন কোন সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হৃদয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, যখন কোন বিশেষ শব্দ বা আয়াত আপনার হৃদয়ের অভ্যন্তরে নতুন এক অনুভূতির স্ফূলিংগ প্রজ্বলিত করে দেয়। আবার কখনো হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করতে সতর্ক ও দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হয়। আপনি যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যথার্থ সাড়া না পান, তাহলে একটু থামুন এবং যা পড়ছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন যতক্ষণ তা না

পাচ্ছেন। আপনার অন্তর যদি চায়, তাহলে কোন বিশেষ আয়াত অনেকবার পুনরাবৃত্তি করার একটি আন্তরিক আগ্রহ আপনার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আপনি যদি সতর্কভাবে পুনরাবৃত্তি করেন, একটু থেমে গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে দেখবেন আপনার হৃদয় ত্বরিতগতিতে সাড়া দিচ্ছে।

এই গুণ অর্জন করাটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআন পাঠ করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার হৃদয় কুরআনের সাথে একাত্ম না হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার হৃদয় এবং কুরআনের মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টি না হবে বুঝতে হবে তোমার পড়া হচ্ছে না। সুতরাং উঠে যাও এবং পড়া বন্ধ কর (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

ভাষার সাড়া

দ্বিতীয় ঃ কুরআনে আপনি যা পড়েন, তার যথার্থ সাড়া আপনার ভাষার শব্দে প্রকাশিত হতে দিন। শব্দগুলোও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হয়ে আসা উচিত। কেননা, বিস্ময়সূচক বাক্যগুলো সর্বদা কুরআন থেকে উৎসারিত আপনার হৃদয়ের গভীর অনুভূতির প্রকাশ ঘটায়। যেমন আনন্দ ও বেদনায় কান্না, ধন্যবাদ, ভালোবাসা, ভয় ও দুশ্চিন্তা ইত্যাদি আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কিন্তু পুনরায় একথা প্রণিধানযোগ্য যে, এর মধ্যে যদি স্বতঃস্ফূর্ততা না থাকে, তথাপি এ জন্য চেষ্টা চালাতে হবে।

এভাবেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। হুযাইফা (রা) বলেন, এক রাতে আমি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে নামায পড়ি। তিনি সূরা আল বাকারা থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন। যেসব আয়াতে মহান আল্লাহ ক্ষমার উল্লেখ করেছেন, সে সকল আয়াত পাঠকালে নবীজী ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। শাস্তি সম্পর্কিত একটি আয়াত পাঠকালে তিনি আল্লাহর কাছে শাস্তি থেকে নাজাত চাইলেন। আল্লাহর মহিমা ও অনুপম গুণের উল্লেখিত একটি আয়াত পাঠ করার সময় তিনি সুবহানাল্লাহ বলে আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করলেন (সহীহ মুসলিম)।

অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায় আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে। রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের (রা) ফুফু মায়মুনার গৃহে তিনি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছনে নামায আদায় করেছিলেন (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

কতগুলো নির্দিষ্ট আয়াতের প্রতি এভাবে সাড়া দেয়া উচিত যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষা দিয়েছেন। সূরা ত্বীনের শেষ আয়াত (আল্লাহ কি সব বিচারকের চাইতে অধিক বড় বিচারক নন) পাঠ করলে তার জবাব দেওয়া উচিত এই বলে যে, 'হ্যা, অব্যশই আমি এর সাক্ষ্যদাতাদের একজন'। যিনি সূরা আল মুরসালাতের শেষ আয়াত (এই কুরআনের পর আর কোন কালাম কি এমন থাকতে পারে যার প্রতি এরা ঈমান আনেব?) পাঠ করবেন, তার বলা উচিত, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি (সুনান আবু দাউদ)।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তিনি জিনদের কাছে সূরা আর রাহমান পাঠকালে যখনই বলতেন 'ফাবিআইয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাযযিবান', তখন তারা বলে উঠতেন, 'হে আমাদর প্রভু! না, আমরা তোমার কোন অনুগ্রহকেই অস্বীকার করি না। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য।'

এগুলো হচ্ছে মাত্র কতিপয় ঘটনা যা থেকে আমার জানতে পারি আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দৃষ্টান্ত ও শিক্ষাসমূহ। এসব দৃষ্টান্তের আলোকে আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে অথবা অনুতাপ করে, ক্ষমা চেয়ে, আল্লাহর অসন্তোষ ও জাহান্নামের আগুন থেকে পানা চেয়ে এবং আল্লাহর কাছে জান্নাত চেয়ে প্রশংসা, মহিমা, সম্মতি, অস্বীকৃতি এবং আবেদনের জন্য আপনার নিজস্ব জবাব ভেবে চিন্তে বানিয়ে নেয়া আপনার জন্য কোন কঠিন কাজ নয়।

আপনার চোখের অশ্রু

তৃতীয় ঃ কুরআনে আপনি যা পড়েন, তার জবাবে 'আনন্দ ও বেদনার অশ্রু' আপনার হৃদয়ের সাড়া চোখ দিয়ে প্রবাহিত হতে দিন।

আপনার হৃদয়ের অবস্থা যদি যে কুরআন আপনি পাঠ করছেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে এটা হতে বাধ্য। আপনার হৃদয় যদি অমনোযোগী

অথবা মৃত বা বন্ধ্যা হয় কেবল সে অবস্থাতেই চক্ষু শুষ্ক থাকবে। শুধু আল্লাহর ভয়েই সর্বদা চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠবে তা নয়। বরং সত্যকে পাওয়ার আনন্দে, আল্লাহর অসীম দয়ার অনুধাবন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ হতে দেখেও বান্দার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হবে।

তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যকে জানা ও চেনার প্রভাবে তাদের চক্ষুসমূহ অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে যায় (আল মায়িদা ঃ ৮৩)।

আর তারা কাঁদতে কাঁদতে নতমুখে পড়ে যায় (আল ইসরা ঃ ১০৯)।

আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবা কিরাম (রা) এবং তাঁদের মত যাঁরা কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন, তাঁরা কুরআন তিলাওয়াতের সময় প্রায়ই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন।

আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই কুরআনকে দুঃখের সাথে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং তোমরা যখন কুরআন পাঠ কর নিজেকে দুঃখিত কর (আবু ইয়ালা, আবু নুয়াইম)। আকেরটি হাদীসে বলা হয়েছে, কুরআন পাঠ কর এবং কাঁদো, যদি স্বতঃস্ফূর্ত কান্না না আসে, তবুও কাঁদো (ইবনে মাজাহ)।

কুরআন কি বলছে এবং আপনার প্রতি কি নির্দেশ করছে, তা যদি একবার আপনি গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং ভাবেন, তাহলে আপনার গাল গড়িয়ে থেমে থেমে অশ্রুধারা নেমে আসতে খুব বেশি সময় নিবে না। কুরআন আপনার প্রতি যে ভালো খবর, কঠোর দায়িত্বের বোঝা ও সতর্কবাণী বহন করে এনেছে, তার চিন্তা করে আপনি নিজেই কাঁদতে পারেন।

আপনার চালচলন

চতুর্থ ঃ চালচলনের মন একটি ভঙ্গি আপনি গ্রহণ করুন, যা আপনার প্রভুর বাণীর প্রতি আপনার হৃদয়ের পবিত্রতা, নিষ্ঠা ও আত্মসমর্পণই প্রতিফলিত করবে।

এমন আচরণের কথা কুরআন অনেক জায়গাতেই উল্লেখ করেছে ঃ সত্যিকারের বিশ্বাসীগণ 'নতমুখে পড়ে যাবে', 'নিজেরাই মস্তক অবনত করবে', 'নিস্তব্ধতা ও

মনোযোগের সাথে কুরআন শুনবে এবং শিহরিত হয়ে শরীর কাঁপতে থাকবে। কুরআনে যা পাঠ করছেন দেহে তার কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত কতক আয়াত পাঠে সিজদা করার বাধ্যবাধকতা তারই একটি নির্দেশিকা। এই দৈহিক ভঙ্গি বা চালচলন কেন গুরুত্বপূর্ণ? একজন মানুষের দৈহিক অবস্থার উপর তার মানসিক অবস্থার গভীর প্রভাব রয়েছে। দেহের অস্তিত্বই হৃদয়ের অস্তিত্ব বজায় রাখে। একটি সাধারণ বই পড়া ও কুরআন অধ্যয়নের মধ্যে দৈহিক ভঙ্গিমায় অনেক ব্যাপক পার্থক্য হতে হবে। অতএব, কুরআন পাঠের অনেক আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিখানো হয়েছে।

ইমাম গাযযালী (রহ) বলেন, প্রথমে উযু কর, শান্তশিষ্টভাবে কেবলামুখী হয়ে বসো, মাথা নত করে রাখ, ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে বসো না কিন্তু এমনভাবে বসো যেন তুমি তোমার প্রভুর সামনে বসেছ। ইমাম নববী তাঁর 'কিতাবুল আযকার' গ্রন্থে আরও কিছু বেশি উল্লেখ করেছেন। 'মুখ পরিষ্কার হতে হবে, বসার জায়গা পবিত্র হতে হবে, মুখ কিবলার দিকে থাকতে হবে, দৈহিক বিনয় প্রকাশ হতে হবে।'

তারতীলের সাথে পড়া

পঞ্চম ঃ তারতীল সহকারে কুরআন পাঠ করুন।

ইংরেজী ভাষায় কোন একটি শব্দ দ্বারা তারতীলের অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আরবীতে এর অর্থ হচ্ছে ভাষা, দেহ ও মনের পরিপূর্ণ ঐকতান বজায় রেখে আস্তে আস্তে, থেমে থেমে, স্পষ্টভাবে, শান্তভাবে পরিমিত স্বরে, চিন্তা ভাবনা করে পড়া।

এটাই হচ্ছে কুরআন পাঠের কাংখিত পদ্ধতি, যা আল্লাহ্ তা'আলা শুরুতেই শিক্ষা দিয়েছেন। আর এটাই তিনি অনুসরণ করতে বলেছিলেন আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যখন রাত্রের অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে নামায ও কুরআন মাজীদ পড়তে আদেশ করেছিলেন (আল মুয্যাম্মিল ঃ ৪)। আস্তে আস্তে ও পর্যাক্রমে কুরআন নাযিল করার কারণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

এভাবে তোমাদের হৃদয়কে যেন আমরা মযবুত করতে পারি (আল ফুরকান ঃ ৩২)।

হৃদয় ও কুরআন অধ্যয়নের মধ্যে মিলন ঘটানোর জন্য এবং মযবুতি ও গভীরতা সৃষ্টির জন্য 'তারতীল' একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান। বকবক করে দ্রুত পড়ার চাইতে তারতীলের সাথে পড়া বিস্ময় ও শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটায়, বুঝতে ও চিন্তা করতে সাহায্য করে এবং আত্মার উপর এক অনপনেয় ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়।

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, তারতীলের সাথে সূরা আল বাকারা ও আলে-ইমরান পাঠ করাকে আমি দ্রুত সমগ্র কুরআন পড়ার চাইতে আমার জন্য উত্তম মনে করি। অথবা তারতীলের সাথে সূরা যিলযাল ও আল কারীয়া পাঠকে সূরা আল বাকারা ও আলে ইমরান পড়া অপেক্ষা উত্তম।

তারতীল বলতে শুধু নীরবতা, স্পষ্টতা, বিরতি ও ভাবনা, দেহ ও হৃদয়ের ঐকতানই বুঝায় না, বরং কিছু শব্দ ও আয়াতের বাধ্যতামূলক পুনরাবৃত্তি বুঝায়। একটি বিশেষ আয়াত দ্বারা হৃদয় একবার বিশেষিত হলে যতবার আপনি পাঠ করবেন ততবারই নতুন মজা ও আনন্দ পাবেন তা থেকে। বারবার পাঠ করায় হৃদয় ও যা আপনি পাঠ করছেন তার মধ্যে এক ঐক্যতানের সৃষ্টি হয়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, একবার তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে) বিশবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। একবার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সারা রাত পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন- 'এখন আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনার বান্দা, আর যদি মাফ করে দেন, তবে আপনি তো সর্বজয়ী, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান' (আল মায়িদা ঃ ১১৮)। সাঈদ ইবন জুবাইর এই আয়াতটি পড়তে থাকলেন, 'হে অপরাধীরা, তোমরা আজ (বিচারের দিন) আলাদা হয়ে যাও (ইয়াসীন)' আর কাঁদতে থাকলেন এবং চোখের পানি ফেলতে থাকলেন। (ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন)

পবিত্রতা অর্জন

ষষ্ঠ ঃ নিজেকে পবিত্র করুন যতটা পারেন।

আপনারা জানেন যে, পবিত্রতা ছাড়া কেউই কুরআন স্পর্শ করতে পারে না

(আল ওয়াকিয়া ঃ ৭৯)। এই আয়াতে উদারভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝানো হয়েছে ধর্মীয় পরিচ্ছন্নতা। অর্থাৎ আপনাকে ধর্মীয় বিধান মতে উযুর মাধ্যমে পবিত্র হতে হবে। এ কথা সম্পূর্ণরূপে অনেক হাদীস ও ইজমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দেহ, পোশাক ও জায়গার পরিচ্ছন্নতা ছাড়া পবিত্রতার আরও অনেক দিক রয়েছে।

আপনারা এটাও দেখেছেন যে, নিয়ত ও উদ্দেশ্যের পবিত্রতার গুরুত্ব কত বেশি। যে পাপ আল্লাহর ক্রোধের কারণ হতে পারে, সে পাপ থেকে হৃদয় ও অংগসমূহের পবিত্র থাকা সমান গুরুত্বের অধিকারী। কোন মানুষই পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু যতটা সম্ভব আপনি পাপ কাজ বর্জন করে চলতে পারেন। যদি আপনি কিছু করেই ফেলেন, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন এবং তাওবা করুন, ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আপনাকে এ সম্পর্কেও যত্নবান হতে হবে যে, যখন কুরআন পাঠ করছেন, আপনি হারাম খাদ্য গ্রহণ করছেন না, হারাম কাপড় পরিধান করছেন না, হারাম উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করছেন না। আপনি যত পবিত্রতম হবেন, আপনার হৃদয় ততো বেশি আপনার সাথে থাকবে, হৃদয় যতো বেশি আল-কুরআনের নিকট উন্মুক্ত হবে আপনি ততো বেশি বুঝ ও ফায়দা হাসিল করতে পারবেন এ থেকে। আর আপনি ততো বেশি তাদের মত হতে পারবেন, যারাই শুধু স্পর্শ করার অধিকারী এই মহান কুরআন, যা লিপিবদ্ধ রয়েছে এক সুরক্ষিত গ্রন্থে (আল ওয়াকিয়া ঃ ৭৭-৭৮)।

আল্লাহর সাহায্য চাওয়া (দুআ)

সপ্তম ঃ যখন কুরআন পাঠ করেন, তখন আল্লাহর করুণা, ক্ষমা, হিদায়াত ও নিরাপত্তার জন্য দুআ করুন। এটা চাইতে হবে হৃদয় দিয়ে, কথা দিয়ে, কর্ম দিয়ে। কুরআনের আলোকে পথ চলতে গেলে আপনাকে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল হতে হবে। এই নির্ভরশীলতার অনুভূতিতে অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত হওয়া উচিত নয়, বরং এটা অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। আপনার চলার পথের প্রতিটি পদক্ষেপেই তাঁর সাথে আপনার সাক্ষাত করতে হবে। তাঁর কাছে আপনার সাহায্য চাওয়া উচিত যাতে করে আপনার হৃদয়কে সক্রিয় রাখতে পারেন, কুরআন বুঝতে এবং এর অনুসরণ করতে। আপনার দুর্বলতা ও অযোগ্যতার জন্যও তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবা এবং আল্লাহর প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন থেকে সতর্ক থাকুন। এগুলো মহাপাপ। আপনার যা দরকার তা হলো, অহংকারের বদলে বিনয়, স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে তাওয়াক্কুল।

যা আপনি চাবেন, তা দেয়া হবে- সর্বদাই আপনার মধ্যে এই আশাবাদ, বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা থাকতে হবে। এটা ছাড়া আপনার দুআ আপনার জন্য খুব একটা উপকারে আসবে না। এটি হচ্ছে কুরআনের একটি অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

হে পরওয়ারদিগার! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণই নাযিল করবে আমি তার মুখাপেক্ষী (আল কাসাস ঃ ২৪)।

নিজের আল্লাহর রহমত থেকে তা কেবল গোমরাহ লোকরেই নিরাশ হয়ে থাকে (আল হিজর ঃ ৫৬)।

তোমাদের রব বলেন ঃ

আমাকে ডাক, আমিই তোমাদের দুআ কবুল করবো। যেসব লোক গর্ব ও অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে আমার ইবাদত করা হতে বিমুখ থাকে, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত, অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে দাখিল হবে (মু'মিন ঃ ৬০)।

আমি তাদের অতি নিকটে। আমাকে যে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং উত্তর দিয়ে থাকি। কাজেই আমার ডাকে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের কর্তব্য। এসব কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও। হয়তো তারা প্রকৃত সত্যপথের সন্ধান পাবে (আল বাকারা ঃ ১৮৬)।

আসুন, আমরা আরও কতিপয় কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া উচিত।

আল্লাহর হিফাযাত

আমি প্রত্যাখাত শয়তান হতে আল্লাহর পানাহ চাই। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম।

ইতোমধ্যে আমরা এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছি যে, শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এটা কুরআনেই নির্দেশ করা

হয়েছে (আন নহল ঃ ৯৮)। শুধু এই শব্দগুলোকে একটি শাস্ত্রীয় বা ম্যাজিক ফর্মুলা হিসেবে উচ্চারণ করবেন না। আপনাকে অনুধাবন করতে হবে যে, আপনার কাজে আপনাকে বিরাট বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। শয়তান আপনার সবচাইতে বড় দুশমন। আপনাকে আপনার পরিশ্রমের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করার জন্য যা করা সম্ভব তার সবকিছুই সে করবে। আল্লাহ এবং কেবল আল্লাহই পারেন আপনাকে শয়তানের এ ষড়যন্ত্র থেকে হিফাযাত করতে।

মাঝে-মধ্যে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার জন্য কুরআন থেকে পাওয়া (আল মুমিনুন ঃ ৯৯)। অথবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষা দিয়েছেন যে শব্দগুলো, তা মাঝে-মধ্যে ব্যবহার করতে পারেন অথবা কুরআনের দুই সূরা ফালাক ও নাস পড়তে পারেন।

আপনার হৃদয় সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সময়ে সময়ে আপনার উচিত আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

হে আমাদের প্রভু! তুমিই যখন আমাদের সঠিক সোজা পথে চালিয়ে দিয়েছ, তখন তুমি আমাদের মনে কোন প্রকার বক্রতা ও কুটিলতার সৃষ্টি করে দিও না। আমাদেরকে তোমার মেহেরবাণীর ভাণ্ডার হতে অনুগ্রহ দান কর, কেননা প্রকৃত দাতা তুমিই (আলে ইমরান ঃ ৮)।

কুরআন অধ্যয়নের শুরুতেই আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা অপরিহার্য হলে কুরআনের বক্তব্য এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এটা একটি অব্যাহত কাজ হওয়া উচিত।

আল্লাহর নামে

পরম দয়ালু ক্ষমাশীল আল্লাহর নামে ঃ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। পবিত্র কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে একটি মাত্র সূরা বাদে সবগুলোর শুরুতে এই আয়াতটি রয়েছে। তাঁর নামে শুরু করা এই তাৎপর্য বহন করে যে, কুরআনের এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার জন্য যিনি সব ধরনের সাহায্য দান করেছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

কুরআনের আশীর্বাদ প্রার্থনা

- আরও কতগুলো নির্দিষ্ট দুআ রয়েছে, সেগুলো আপনার শিখা উচিত।

হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও (তাহা ঃ ১১৪)।

আল্লাহ তা'আলা যখন কুরআন গ্রহণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ধৈর্যশীল ও অটল থাকার জন্য সতর্ক করেন, তখন তাঁকে এই শব্দগুলো দিয়ে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন- 'এবং কুরআনের সাথে তাড়াহুড়া করো না, শীঘ্র এর প্রত্যাদেশ তোমার প্রতি সম্পূর্ণ হবে'। কুরআনের অর্থের সাথে আঁকড়িয়ে থাকতে চাইলে আল্লাহর নামে সাহায্য প্রার্থনা করা বিশেষভাবে উপকারী হয়ে থাকে। কেবল ধৈর্য ও আল্লাহর সাহায্যই বিভ্রান্তি দূর করতে পারে, জট খুলে দিতে পারে এবং কেউ কুরআনের বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে পারে।

আরেকটি চমৎকার দুআ

হে আমার প্রভু! আমি তোমার দাস, তোমার দাসের সন্তান, তোমার দাসীর সন্তান, আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীন, আমার ললাট তোমার হাতে। তোমার প্রতিটি নির্দেশ আমার ব্যাপারে চূড়ান্ত। তোমার প্রতিটি সিদ্ধান্ত সঠিক এবং ইনসাফপূর্ণ। হে প্রভু! তোমাকে ডাকি তোমার সমস্ত নামে, যত নামে তুমি তোমাকে আখ্যায়িত করেছ, বা তোমার সৃষ্টিকে শিখিয়েছ, যা তুমি তোমার পবিত্র কিতাবে নাযিল করেছ, অথবা যা তুমি তোমার মধ্যে গোপন রেখেছ। হে আমার প্রভু! কুরআনকে আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রেরণা-উৎস, আমার অন্তরের জ্যোতি, আমার দুঃখ নিবারণকারী, উদ্বেগ ও চিন্তা উপশমকারী বানিয়ে দাও (আহমাদ, রুজাইন)।

নিম্নোক্ত দুআটি সাধারণভাবে সমস্ত কুরআন পাঠ সমাপ্ত করার পর পাঠ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এর মর্ম এত ব্যাপক যে, ঘন ঘন এই সব শব্দের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকা হলে আল্লাহ নিশ্চিতই বিরাট আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন। হে আমার প্রভু! মহান গ্রন্থ কুরআনের মাধ্যমে আমার উপর করুণা বর্ষণ কর। কুরআনকে আমার জন্য নেতা, আলোকবর্তিকা, পথ-প্রদর্শক ও রহমত বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ!

যা আমি ভুলে গিয়েছি, কুরআনের মাধ্যমে তা আমাকে স্মরণ করার তাওফীক দান কর এবং শিখিয়ে দাও। দিনে ও রাতে আমাকে এটি তিলাওয়াত করার শক্তি দান কর। হে দুনিয়া জাহানের মালিক! আমার পক্ষে কুরআনকে একটি প্রমাণ বানিয়ে দাও।

কুরআন পাঠের আগে, কুরআন পাঠকালে এবং কুরআন পাঠ শেষে আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করুন যে ভাষায়ই হোক আর যেভাবে আপনি পছন্দ করুন। এ সম্পর্কে কুরআনের তিনটি বর্ণনা আপনি পাবেন সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬, আল মুমিনুন ঃ ১১৮ এবং আলে ইমরানে ঃ ১৯৩।

সাধারণ প্রার্থনা

উপরে উল্লিখিত এসব নির্দিষ্ট দুআ ছাড়াও আপনি আপনার নিজের ভাষায় কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করুন। যেমন ঃ 'আমার দৃষ্টি খুলে দাও, সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে দেখার শক্তি দাও, সেই অলোকশিখা দাও যা দিয়ে আমি তোমার পথ চিনতে পারি, আমার প্রচেষ্টায় সহায়তা দান কর, আমার ইচ্ছাশক্তি বিনয়ী করে দাও, তোমার ক্ষমা ও হিদায়াত পেয়ে আমাকে আনন্দ লাভ করার তাওফীক দান কর, আমার উৎকণ্ঠা, আমার সিদ্ধান্ত ও আমার সকল ব্যাপারে আমাকে পথ প্রদর্শন কর, সমস্ত প্রলোভনের বিরুদ্ধে আমাকে প্রতিরোধ ক্ষমতা দান কর, সব দায়িত্ব পালন করার শক্তি দান কর, আমার অলসতা ও জড়তা দূর করে দাও, তোমার বাণী আমার চিন্তা ও কর্মকে উজ্জীবিত করুক ও আমার প্রতিটি প্রয়োজন পূরণ করুক, আমাকে শান্ত করে দাও যখন আমি অশান্ত, প্রশান্তি দাও যখন আমি বিপন্ন, আমাকে অধ্যয়ন করতে এবং বুঝতে সাহায্য কর, তোমাকে এবং তোমার হিদায়াত জানার ও বুঝার তাওফীক দান কর, আমাকে ধৈর্য্য দাও, আমাকে সম্মান ও মর্যাদা দান কর, আমাকে গ্রহণ করার এবং পালন করার শক্তি দান কর, যা আমি শিখি তদনুযায়ী জীবন যাপন করার তাওফীক দান কর, কুরআন যে মিশন আমাকে দিয়েছে তা পরিপূর্ণ করার সামর্থ্য আমাকে দান কর।

উপলব্ধি সহকারে অধ্যয়ন

কি পড়ছেন এই উপলব্ধি আপনাকে গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়নে নিয়োজিত

করবে। কুরআন অধ্যয়নে এটি শেষ কিন্তু কোনক্রমেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর পন্থা হতে পারে।

কুরআনের বাণী হৃদয়ে গভীরভাবে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে কুরআন কি বলছে তা বুঝা সবার জন্য অপরিহার্য হলেও এটা কোন চূড়ান্ত শর্ত নয় যা ব্যতীত কুরআন থেকে আদৌ কোন আশীর্বাদ লাভ করা যাবে না। অনেকে এমন আছেন, যারা কুরআনের প্রতিটি শব্দ বুঝে থাকেন কিন্তু তথাপি তাদের হৃদয়ের দরজা কুরআনের জন্য বন্ধ থাকে। আবার এমন অনেকে আছেন, যারা একটি শব্দও বুঝেন না, তথাপি তারা অত্যন্ত গভীর একাগ্রতা, আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক, ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহর নৈকট্য ও আনুগত্য লাভ করে থাকেন। এটা এ কারণে যে, কুরআনের সাথে সম্পর্ক অনেক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। ইতোপূর্বে আমরা সাতটি পূর্বশর্তের উল্লেখ করেছি, যার মধ্যে বুঝে পড়া একটি। সর্বদাই এমন অসংখ্যা লোক থাকবেন, যারা কখনও আরবী ভাষা শিখবেন না, অনুবাদ পড়তে সক্ষম হবেন না আর না তারা এ জন্য প্রচেষ্টা চালাতে সময় পাবেন। তথাপি তাদের হতাশ হবার কোন কারণ নেই। যে পর্যন্ত না তারা কুরআন বুঝার উপায় খুঁজে পাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন, যে পর্যন্ত না তারা প্রয়োজনীয় শর্তসহ অগ্রসর হবেন, যে পর্যন্ত না তারা কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী চলার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবেন, সে পর্যন্ত অবশ্যই তাদের কুরআন পড়তে হবে যদি তারা এর অর্থ নাও বুঝেন এবং তাদের অবশ্যই কুরআনের আশীর্বাদ পাওয়ার আশাও পোষণ করতে হবে।

এতদ্‌সত্ত্বেও কুরআন আপনাকে যা বলেছে, তা অনুধাবনের অপরিসীম গুরুত্ব কোনক্রমেই বিন্দুমাত্র কমতে পারে না। এখানে 'অনুধাবন' ব্যবহার করা হয়েছে কুরআনে যা বলা হয়েছে তা সরাসরি জানার অর্থে। চিন্তা-ভাবনা, অনুসৃতির অন্যান্য স্তর পরিপূর্ণ অর্থে বুঝে পাওয়া, এটাকে আমাদের চিন্তার সাথে সমন্বিত করা ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা পরবর্তী সময়ে আলোকপাত করবো।

কেন সরাসরি অর্থ অনুধাবন করা প্রয়োজন? প্রথমত, কুরআনের সরাসরি অর্থের উপর কনসেনট্রেশন বা আপনার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে, সচেতনতার বিভিন্ন অবস্থা উদ্দীপ্ত করতে, আপনার অন্তরাত্মাকে কুরআনের মুখোমুখি আনার

জন্য দেহ ও আত্মার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি বিরাট রকমের সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত ঃ কেবল অনুধাবনের মাধ্যমেই আপনি আপনার বিশ্বাসকে গভীর করতে পারবেন, যা প্রকৃতপক্ষে আপনাকে ঈমান এবং কুরআনের শিক্ষার সাথে বেঁচে থাকার দিকে পরিচালিত করবে। ■

কুরআনের সাথে দীর্ঘস্থায়ী সাহচর্যই হতে হবে আমাদের হৃদয়ের সবচাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা ও কাজ। অতএব, যতবার যত বেশি পারেন কুরআন অধ্যয়ন করুন। এ কাজে যত বেশি সময় আপনার পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব, ততো বেশি করুন। বিশেষ করে রাত্রিকালে, এভাবেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবা কিরাম আল্লাহর পথে নিজেদের প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই মহান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য, যা কুরআন তাঁদের উপর ন্যস্ত করেছিল। এ ব্যাপারে কতিপয় নির্দেশিকা এবং বিধি রয়েছে, যা আপনাকে সর্বদাই বিবেচনায় রাখতে হবে।

আপনি কতবার পড়বেন

প্রতিদিন কুরআনের কিছু না কিছু অংশ আপনাকে অবশ্যই পড়তে হবে। বস্তুতপক্ষে এমন একটি দিনও অতিবাহিত হওয়া উচিত নয়, যেদিন আপনি কুরআনের জন্য কিছু সময় ব্যয় না করবেন। মাঝে-মধ্যে পড়া বা এক বড় অংশ পড়ার চাইতে নিয়মিত পড়াই উত্তম যদি তা খুব সামান্য অংশও হয়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ সেই কাজই পছন্দ করেন, যা নিয়মিত করা হয়, তা যদি সামান্যও হয় (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)। তিনি বিশেষ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, আপনাকে অবশ্যই নিয়মিত কুরআন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে হবে। অন্যথায় আপনি সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কুরআনের সাথীদের কাহিনী হচ্ছে দড়িতে বাঁধা উটের মত, যতক্ষণ কেউ তা ধরে রাখে, ততক্ষণ তার হাতে থাকে আর যদি তা সে ছেড়ে দেয়, তাহলে পালিয়ে যায় (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

কি পরিমাণ পড়বেন

এর কোন নির্দিষ্ট জবাব নেই। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং অবস্থাভেদে এটা কম-

বেশি হবে। এর দিক-নির্দেশনা তাই হবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় মানবিক উপায়-উপকরণ বিবেচনা করে বলেছেন-

যতটা কুরআন তুমি সহজে পাঠ করতে পার, ততটাই পড়তে থাক (আল মুয্‌যাম্মিল ঃ ২০)।

এ ব্যাপারে সাহাবা কিরাম ও তাঁদের অনুসারীদের প্রাকটিস সংগতভাবেই কম-বেশি ছিল। কেউ দুই মাসে, কেউ এক মাসে, কেউ দশ দিনে, কেউ এক সপ্তাহে এমনকি কেউ একদিনেও পুরো কুরআন শরীফ পড়ে শেষ করতেন। আমাদের উচিত নিম্নোক্ত হাদীসটিকে নিয়ন্ত্রক মাপকাঠি হিসেবে স্মরণ রাখা। যিনি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন শেষ করেন, তিনি তা বুঝেন না (সুনান আবু দাউদ, জামে আত্ তিরমিযী)।

একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত ইবন উমার (রা)-কে এক মাসে কুরআন শেষ করতে বললে ইবন উমার (রা) তার চাইতে কম সময়ে তা করতে পীড়াপীড়ি করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সাত দিনের মধ্যে পড়ো এর উপর বৃদ্ধি করো না (সহীহ আল বুখারী)। কুরআন ৭ হিজব এবং ৩০ পারায় বিভক্ত। এ থেকেও কিছু ইংগিত পাওয়া যায় যে, কোনটা কাংখিত।

এ ব্যাপারে ইমাম নববীর উপদেশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যিনি ধ্যানমগ্নভাবে কুরআন অধ্যয়ন করে এর গভীর অর্থ ও তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পারেন, তার উচিত কম পরিমাণ পড়া। অনুরূপভাবে যাকে শিক্ষা, সরকারী কাজ বা ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ কাজে সময় নিয়োজিত করতে হয়, তিনি কম পড়তে পারেন (কিতাবুল আযকার)।

পড়ার পরিমাণটা নির্ভর করবে পড়ার উদ্দেশ্যের উপর। আপনি যদি শুধু কুরআন অধ্যয়নে সময় দিতে চান অথবা দ্রুত সাধারণ ধারণা নিতে চান, আপনি দ্রুত পড়তে পারেন, বেশি পড়তে পারেন। আর আপনি যদি এ নিয়ে চিন্তা করতে চান ও বাস্তবে প্রতিফলিত করতে চান, তাহলে আস্তে ধীরে পড়ুন এবং কম পড়ুন। ইমাম গাযযালী (রহ) একথাই বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি কোন

কোন সময় প্রত্যেক শুক্রবার কুরআন পড়ে শেষ করে ফেলি, কোন সময় প্রত্যেক মাসে, আবার কোন সময় প্রত্যেক বছর যাবত কিন্তু এ পর্যন্ত আমি তা পারিনি (ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন)।

আমি মনে করি, আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমাদের অধিকাংশেরই কমপক্ষে আট মাসে একবার করে কুরআনের সমস্ত অংশের একটি সাধারণ পাঠ দেয়ার চেষ্টা করা উচিত। আপনি সরাসরি অর্থ বুঝুন আর অনুবাদের মাধ্যমেই বুঝুন এতে কোন মতেই প্রতিদিন ৫-১৫ মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা নয়।

কিন্তু আপনার জীবদ্দশায় মাত্র কয়েকবার হলেও আপনাকে মাত্র ৭ দিনে কুরআন পাঠ সমাপ্ত করতে চেষ্টা করা উচিত। অথবা এক মাসে বিশেষভাবে রমযান মাসে। কোন কোন সময় গভীর চিন্তা-ভাবনা করে খুব ধীরে-সুস্থে কুরআন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করা উচিত যদি প্রতিদিন নাও হয়।

কখন পড়তে হবে

দিন বা রাতের কোন সময়ই কুরআন অধ্যয়নের জন্য অনুপযোগী নয়। কিংবা এ সম্পর্কে কোন দৈহিক ভংগিরও প্রয়োজন নেই। আল্লাহ বলেন, তোমার প্রভুর নাম স্মরণ কর সকালে এবং সন্ধ্যায় ও রাত্রির অংশবিশেষে (আদ দাহর ঃ ২৫)।

যারা উঠতে, বসতে ও শয়ন করতে সকল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে (আলে ইমরান ঃ ১৯১)।

নিশ্চয়ই কুরআন অধ্যয়ন আল্লাহর স্মরণ বা যিকরের সর্বোত্তম পথ। ইমাম নববী (রহ) বলেন, সাহাবা কিরাম ও তাঁদের অনুসারীগণ দিনের বা রাতের যেকোন সময়ে কুরআন অধ্যয়ন করতেন, চাই তারা কোন জায়গায় অবস্থান করুন আর সফরই করুন।

এতদ্‌সত্ত্বেও এমন কিছু কাংখিত সময় আছে, যা কুরআন ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে যে সময় কুরআন অধ্যয়ন করলে বেশি ফল পাওয়া যায় বা লাভবান হওয়া যায়। অতএব, নির্দিষ্ট কছু ধরন বা মেজাজ আছে। রাতই কুরআন পাঠের সবচাইতে চমৎকার সময় এবং সবচাইতে কাংখিত ভংগি হচ্ছে নামাযে দাঁড়িয়ে। প্রাথমিক সূরা আল মুযযাম্মিল

এবং আরও কতিপয় স্থানে কুরআন আমাদের একথাই বলে (আলে ইমরান ঃ ১১৩, আল ইসরা ঃ ৭৯, আয যুমার ঃ ৯)। রাত্রিকালীন নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন পড়া আপনার হৃদয়কে পাঠের সাথে একীভূত করে দেয় এবং আল্লাহর পথ-নির্দেশের প্রতি আপনার আত্মসমর্পণের ইচ্ছাকে শক্তিশালী করে এবং তিনি যে মিশন আপনার উপর অর্পণ করেছেন, তা পূরণ করতে সাহায্য করে।

এটা করতে হলে আপনার জন্য প্রয়োজন (ক) কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করা এবং (খ) রাত্রিকালে কিছু সময়ের জন্য জেগে থাকা। কুরআন এ সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে যে, নানা কারণেই সবসময় সবার পক্ষে এটা সম্ভব নাও হতে পারে। সুতরাং কুরআন আপনাকে এই অনুমতি দেয় যে, আপনি সহজভাবে যতটা পারেন, ততটা কুরআন পাঠ করতে থাকুন। এর অর্থ হচ্ছে যতটুকু অংশ সম্ভব, যত সময় সম্ভব এবং যে অবস্থায়ই সম্ভব আপনি কুরআন পাঠ করুন। রাত্রিকালীন নামাযে কুরআন অধ্যয়নের বিরাট প্রয়োজন ও অসাধারণ উপকারিতা রয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনার উচিত কিছু সময় ব্যয় করা তা যত কমই হোক, এমন কি কয়েক মিনিট হলেও। একটি নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে, ধরা যাক সপ্তাহে অথবা মাসে এজন্য আপনাকে সময় দিতেই হবে।

এমনকি আদর্শ পথের সম্ভাব্য নিকটে থাকার জন্য আশা করা যেতে পারে যে, আপনি ফজর ও ইশার নামাযের আগে বা পরে অথবা সকালে কিংবা শয়নের আগে কুরআন শরীফ পাঠ করবেন। সকাল বেলা কুরআন শরীফ অধ্যয়নের ব্যাপারে বিশেষভাবে বলা হয়েছে (আল ইসরা ঃ ৭৮)। চেয়ারে বসে, বালিশে হেলান দিয়ে, বিছানা বা গাড়ীতে শয়ন করে কুরআন অধ্যয়ন যদিও কাম্য নয় তথাপি নিষিদ্ধও নয়। তবে বিনা কারণে কখনও এরূপ করবেন না বা এ ধরনের করবেন না। যাই হোক, কেউ যদি কুরআন পাঠ থেকে বঞ্চিত হন শুধু এ কারণেই যে, তিনি সঠিক ভংগিমায় বসতে পারেননি, তিনি আরো মুল্যবান অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হন।

শুদ্ধভাবে পড়া

আপানকে অবশ্যই কুরআন শুদ্ধ করে পড়তে হবে। কমপক্ষে স্বরবর্ণ এবং অক্ষরগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে হবে, যদিও তার তাজবীদের সমস্ত আর্ট

শিখতে আপনি সক্ষম না হন। আরবী ভাষা এমন যে, স্বরবর্ণের উচ্চারণে সামান্য ভুল পড়লে মারাত্মকভাবে অর্থ পাল্টে যেতে পারে এবং অনেক সময় অর্থ সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে নূন্যতম প্রাথমিক দক্ষতা হাসিলের জন্য প্রতিদিন এক ঘন্টা করে এক মাস অব্যাহত শিক্ষা লাভ একজন শিক্ষিত বয়স্ক লোকের জন্য যথেষ্ট। শুদ্ধ কুরআন পড়া শিখার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা থেকে কেউ ক্ষমা পেতে পারেন না। যখন আপনি শিখছেন, আপনি পারেন না এটা আপনার পড়া পরিত্যাগ করার জন্য কোন কারণ হতে পারে না। একজন অনারব হয়তো কখনো শুদ্ধ পঠন কৌশল আয়ত্ত করতে পারবে না। অথবা আপনার তা শিখার সুযোগ নাও হতে পারে।

আমি এমন এক জনতার মধ্যে প্রেরিত হয়েছি, যাদের মধ্যে রয়েছে নিরক্ষর, বৃদ্ধ নর-নারী, বালক-বালিকা এবং এমন সব লোক, যারা কখনও একটি বইও পড়েনি (জামে আত্ তিরমিযী)।

হযরত জিবরাঈল (আ)কে লক্ষ্য করে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ ধরনের অসুবিধা সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন। সুতরাং আপনাকে এ সম্পর্কে তাঁর আশ্বাস-বাণীর কথা স্মরণ করা উচিত, যদিও বা সেটাকে তিনি আপনার শিক্ষা লাভের উদ্যম শিথিল বা পরিহারের অজুহাত বানাননি।

যিনি কুরআন পাঠে পারদর্শী, তিনি সেই মহত ও পুণ্যবান ফেরেশতারই সাথী যিনি প্রত্যাদেশ নিয়ে আসেন। আর যিনি পড়তে গিয়ে হোঁচট খান এবং শুদ্ধভাবে পড়া যার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে, তাকে পড়া এবং প্রচেষ্টা চালানোর জন্য দ্বিগুণ পুরস্কারে ভূষিত করা হবে (সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

সুন্দরভাবে পড়া

শুদ্ধভাবে কুরআন পড়ার পর এটাই কাম্য যে, কিরাআতের আর্ট শিখতে হবে যাতে করে সুন্দর, সুমধুর, মনোমুগ্ধকর এবং সুশ্রাব্য কণ্ঠে কুরআন পড়তে পারেন। এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেক হাদীস রয়েছে ঃ

তোমার কণ্ঠ দিয়ে কুরআনকে সৌন্দর্যময় করে তোল (সুনান আবু দাউদ)।

আল্লাহ্ অন্য কোন নবীর তিলাওয়াত শুনেন না, যেরূপ তিনি কোন নবীর সুমধুর তিলাওয়াত শুনেন (অর্থাৎ যিনি সুস্পষ্ট করে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করেন তা যেরূপ শুনেন তদ্রুপ অন্যের তিলাওয়াত শুনেন না)।

যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (সহীহ আল বুখারী)

কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, সত্যিকার সৌন্দর্য তাই, যা অন্তরে আল্লাহর ভয় থেকে উৎসারিত।

তার তিলাওয়াত ও কণ্ঠ এতই সুমধুর যখন আপনি তার তিলাওয়াত শুনবেন, তখন আপনি অনুভব করবেন যে, তিনি আল্লাহকে ভয় করছেন (দারিমী)।

মনোযোগের সাথে শ্রবণ

যখনই কুরআন তিলাওয়াত করা হয় মনোযোগের সাথে শুনুন এবং গভীর নীরবতা অবলম্বন করুন।

এ সম্পর্কে কুরআন নিজেই বলেছে-

যখন কুরআন মাজীদ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপচাপ থাকো। সম্ভবত তোমাদের প্রতিও রাহমাত নাযিল হবে (আল আরাফ ঃ ২০৪)।

এটা স্বাভাবিক যে, যখন আল্লাহ্ কথা বলেন, তখন আপনাকে অবশ্যই চুপচাপ থাকতে হবে। কিন্তু 'শ্রবণের জন্য যে আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ প্রাকৃতিক শ্রবণের একটি কাজই নয় বরং মনোনিবেশ ও গ্রহণের একটি বিশেষ পর্যায়কেও বুঝায়।

কার্যত এ নির্দেশের বিপরীত কোন কিছুই করা যাবে না। কুরআন তিলাওয়াতের সময় কথা বলা বা বক্তৃতা করা কোনটাই করা যাবে না। কিরাআতের ক্যাসেট বাজিয়ে তাকে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে ব্যবহার করে অন্য কিছু, যেমন কথা বলা বা হুইসপারিং করা এসব করা যাবে না। সভা-সমাবেশ ও অনুষ্ঠানের

শুরুতে যখন কুরআন তিলাওয়াত চলবে, তখন কেউ তার প্রতি মনোযোগ দিবে না তা হতে পারবে না।

কোন কোন ফকীহ নিকটস্থ কোন স্থানে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত চলাকালে নামায পড়াও নিষিদ্ধ করেছেন।

এ নিয়মের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে, যদি উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নিকটস্থ লোকদের কুরআনের প্রতি মনোযোগ দিতে অসুবিধার সৃষ্টি হয় অথবা সাড়া দেয়া অসম্ভব হয় এমতাবস্থায় তিলাওয়াতকারীকে তার কণ্ঠ নীচু করতে হবে অথবা নীরবে পড়তে হবে। প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ-এটি হচ্ছে একজনের দায়িত্বের অংশবিশেষ। অধিকন্তু কেউ যদি শুনতে আগ্রহী না হয়, তাহলে কুরআন শ্রবণের ব্যাপারটা তার উপর চাপিয়ে দেয়া অনুচিত।

যারা শুদ্ধভাবে এবং সুন্দর তিলাওয়াত করতে পারে, তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করতে অনুরোধ করা এবং অতঃপর মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করা খুবই কাংখিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবাগণকে তাঁর নিকট কুরআন তিলাওয়াত করতে বলতেন। এ সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) য়া বলেছেন, তা স্মরণ রাখা উচিত ঃ

যিনিই একটি আয়াত শ্রবণ করবেন, তাকে তাঁর দিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে। যিনি তিলাওয়াত করবেন এটি কিয়ামতের দিনে তাঁর জন্য আলো হিসেবে হাযির হবে (মুসনাদে আহমাদ)।

কুরআন খতম করা

যতবারই আপনি কুরআন খতম করুন না কেন, যখনই আপনি পুরো কুরআন পাঠ সমাপ্ত করবেন সে সময়টি আনন্দের, উৎসাহের এবং প্রার্থনার। ইমাম নববী (রহ) এ সম্পর্কে সাহাব কিরাম (রা) ও তাবিঈনের অনুসৃত কতিপয় আমলের উল্লেখ করেছেন। এসব কাংখিত হলেও ফরয নয়। তবে আপনি যতটা পারেন তার অনুসরণ করুন।

এক ঃ শুক্রবারের রাতে শুরু করা এবং বৃহস্পতিবার রাতে শেষ করা। কেউ কেউ সোমবার সকালে শুরু করা পছন্দ করতেন। অন্যরা ভিন্ন সময়

বেছে নিতেন, কোন সময়ই আশীর্বাদবিহীন নয়। প্রতিটি সময় কিয়ামতের দিন সাক্ষী হবে।

দুই ঃ শেষ অংশটুকু নামাযে পড়ুন, যদি খতম দেয়ার সময় আপনি একাকী হন।

তিন ঃ শেষ করার সময় অন্যদের ডাকুন এবং একসাথে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করুন।

যখন সাহাবী আনাস ইবন মালিক (রা) খতম করতেন, তখন তিনি পুরো পরিবারের লোকদের সমবেত করতেন এবং আল্লাহর দরবারে দুআ করতেন (সুনান আবু দাউদ)। হাকাম ইবন উতাইবা থেকে বর্ণিত, একদিন আমাকে মুজাহিদ এবং উবাদাহ ইবন আবি হুযাফার নিকট পাঠানো হলে তারা বললেন, আমরা তোমাকে দাওয়াত করেছি কারণ আমরা কুরআন খতম করতে চাই এবং শেষ করার সময় আল্লাহর কাছে দুআ করতে চাই। অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, কুরআন খতম করার সময় আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়।

চার ঃ যেদিন কুরআন খতম করতে চান সেদিন রোযা রাখুন।

পাঁচ ঃ কুরআন খতম করার পর পরই পরবর্তী খতমের জন্য আবার পাঠ শুরু করুন। অর্থাৎ সূরা নাস পড়ে শেষ করার পর সূরা আল ফাতিহা ও আল বাকারার কতিপয় আয়াত পাঠ করুন। এটি এক অর্থে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণিত হাদীসের দাবী পূরণ করবে ঃ

উত্তম কাজ হচ্ছে পৌছা এবং অবস্থান করা ও যাত্রা শুরু করা। যখন জিজ্ঞেস করা হলো এর অর্থ কি? তিনি জবাব দিলেন, কুরআন খতম করা ও পুনরায় শুরু করা।

ছয় ঃ কুরআন খতম করার সময় আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করুন ও দুআ করুন। এ হচ্ছে আপনার দুআ কবুল এবং আল্লাহর রাহমাত নাযিলের সময়। এটি আমল করার জন্য বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। কেউ যখন কুরআন তিলাওয়াত করে এবং অতঃপর আল্লাহর

কাছে প্রার্থনা করে, চল্লিশ হাজার ফেরেশতা বলেন, আমীন (দারিমী)।

দুআ করুন বিনয়, ভীতি, আশা, নম্রতা, ও দৃঢ়তাসহকারে। প্রার্থনা করুন নিজের জন্য, তবে অবশ্যই সবকিছুর জন্য প্রার্থনা করুন। বিশেষ করে উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক বিষয়ে, উম্মাহর সম্মান ও মর্যাদার জন্য, এর শাসকদের ভালো হবার জন্য, দুশমনদের হাত থেকে মুসলিম উম্মাহর হিফাযতের জন্য, সৎকাজ ও তাকওয়ার বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকার জন্যও প্রার্থনা করুন।

মুখস্থ করা

পবিত্র কুরআনের যতটা পারেন আপনি মুখস্থ করুন। হিফয তথা স্মৃতি সংরক্ষিত থাকার ক্ষেত্রে কুরআন অসাধারণ। আজকাল হিফয শব্দটিকে মুখস্থ করার সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হলেও হিফয বলতে বুঝে পড়া এবং আমল করা দুটোকেই বুঝায়। সত্যিকার অর্থে ইংরেজীতে এমন কোন শব্দ নেই, যা যথার্থভাবে হিফয এর সঠিক ও পুরো অর্থ প্রকাশে সমর্থ।

হিফয এমন একটি অতি প্রয়োজনীয় মাধ্যম, যার দ্বারা কুরআন আপনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এটা কোন যান্ত্রিক বা শাস্ত্রীয় কাজ নয়। এটি উচ্চতর আধ্যাত্মিকতা ও একাগ্রতার গুরুত্ববহ। কেবল হিফযের মাধ্যমেই আপনি নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন এবং কুরআনের ঘোষকের সামনে দাঁড়িয়ে এর অর্থ সম্পর্কে ভাবতে পারেন। এ ছাড়াও হিফয কুরআনকে আপনার ভাষায় প্রবাহিত করে এবং এটা আপনার সার্বক্ষণিক সাথীতে পরিণত হয়। আপনি যত বেশি মুখস্থ করবেন কুরআন পাঠে গভীর মনোনিবেশ করতে এবং অর্থ হৃদয়ংগম করতে আপনার জন্য ততো সহজ হবে।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্নভাবে এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'কুরআন মুখস্থ কর, কেননা আল্লাহ সেই আত্মাকে শাস্তি দেবেন না যার মধ্যে কুরআন রয়েছে' (শারহিস সুন্নাহ)।

যার হৃদয়ে কুরআনের কিছু নেই, তিনি হচ্ছেন এক নিঃসংগ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীর মত (জামে আত্ তিরমিযী)।

অতএব, আপনার কুরআন অধ্যয়নের কিছু সময় থেকে এ জন্য বরাদ্দ করুন। একটি বৈজ্ঞানিক পন্থায় এ ব্যাপারে অগ্রসর হন। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনার লক্ষ্য স্থির করুন। ঐসব অংশ আপনার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযে পড়তেন, অথবা দিন বা রাতের কোন অংশে পড়তেন, অথবা যা তিনি তাঁর সাহাবীদের পড়তে বলতেন, অথবা যেসবের উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেছেন। কিছু অংশ কুরআন তিলাওয়াতকালে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আপনাকে আকৃষ্ট করবে এবং আপনার উচিত ঐসব অংশও মুখস্থ করা। ■

৫ ঃ অধ্যয়ন এবং অনুধাবন

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আপনি কুরআনের পুরোপুরি ও সত্যিকার আশীর্বাদ এবং সম্পদ আহরণ করতে পারেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কুরআনের অর্থ অনুধাবনে আপনাকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত না করছেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার স্রষ্টা কি বলছেন তা জানতে না পারছেন। এমনিক যারা বুঝে না, তারাও কুরআনের আশীর্বাদ পেতে পারে বলে আমরা আগে যা বলেছি এটা তার অস্বীকৃতি নয়। নিঃসন্দেহে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম আরবী জানে না এবং অনেকেরই নিজ ভাষায় অনুবাদগ্রন্থও নেই। তথাপি যদি তারা আন্তরিক একাগ্রতা, বিনয় ও ভালোবাসার সাথে কুরআন পাঠ করে, কুরআনের কিছু ঐশ্বর্য লাভ থেকে তারা ব্যর্থ হবে না। কেননা, আপনি যাকে ভালোবাসেন, তার সাহচর্য লাভ করেন আর যদি তার ভাষা নাও জানেন তথাপি অবশ্যই তার সাথে আপনার সম্পর্ক গভীর হতে বাধ্য তবে সম্পর্ক বেশি মযবুত হবে যদি আপনি তার ভাষা বুঝেন।

পক্ষান্তরে কেবল অর্থ বুঝাটাও কোন কাজে না আসতে পারে। অনেকেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখ থেকে কুরআন শুনেছেন এবং প্রতিটি শব্দ বুঝেছেন, অথচ আরও বিপথগামী হয়েছেন। লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যাদের ভাষা আরবী এবং কুরআন বুঝেছেন অথচ কুরআনের কোন প্রভাব তাদের জীবনে নেই। অসংখ্য মুসলিম ও অমুসলিম পণ্ডিত যারা কুরআন অধ্যয়ন ও অনুশীলনে জীবনটাই কাটিয়ে দেন এবং যাদের পাণ্ডিত্যও নির্ভুল অথচ তাদের জীবনকে কুরআন স্পর্শ করতে পারে না।

তথাপি এতদ্‌সত্ত্বেও নিজেকে কুরআন অনুধাবনে নিয়োজিত করার জরুরী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কুরআন এসেছে হিদায়াত দিতে, স্মরণ করিয়ে দিতে, সতর্কবাণী ও উপশমকারী হিসেবে। এটা শুধু সওয়াবের উৎস, পবিত্র শাস্ত্র, আধ্যাত্মিকতার প্রতীক, পবিত্রতার নিদর্শন অথবা পবিত্র ম্যাজিক নয়। কুরআন এসেছে আপনাকে আমূল পরিবর্তন করে দিতে এবং নব জীবনের দিকে

পরিচালিত করতে। কিন্তু কুরআন বুঝাটাই নবজীবন লাভের জন্য নিশ্চিত গ্যারান্টি নয়। তবে কুরআন বুঝা ব্যতীত কুরআনের সত্যিকার উদ্দেশ্য পূরণ এবং মানবতাকে কুরআনের পথে আহ্বান জানানো খুবই কঠিন কাজ হবে।

ব্যক্তিগত অধ্যয়ন

আমাদেরকে কেন নিজেদের উদ্যোগে কুরআন অনুধাবনে আত্মনিয়োগ করতে হবে এবং এ নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনা করতে হবে? এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আমরা বিজ্ঞ লোকদের নিকট কুরআন পড়ি এবং শ্রবণ করি। না এটা হয় না। এতদ্‌সত্ত্বেও তা প্রয়োজনীয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য কি, তা জানার জন্য আপনাকে অবশ্যই নিজেকেই চেষ্টিত হতে হবে। কুরআন কেবল একটি গ্রন্থ নয়। অথবা কি করা যায় এবং কি করা যায় না, তার তালিকার কোন সংকলনও নয়। এই গ্রন্থ কেবল আল্লাহ সম্পর্কেই এবং আপনার কাছে তিনি কি চান, সে সম্পর্কেই আপনাকে অবহিত করে না। এ গ্রন্থ আপনার ব্যক্তি জীবনকে প্রভাবিত করতে চায়, আপনাকে একটি নতুন জীবন দান করতে চায় এবং আল্লাহর সাথে আপনার গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চায়। সুতরাং এ পবিত্র গ্রন্থের উচিত আপনার ঈমানী শক্তি, আপনার আকাঙ্ক্ষা এবং ধৈর্য বৃদ্ধি করা, আপনাকে পবিত্র করা, আপনার চরিত্র গঠন করা এবং আপনার ব্যবহার সংশোধন করা। উচিত আপনাকে অব্যাহতভাবে উৎসাহিত করা এবং আপনার মধ্যে অনেক উন্নতি সাধন করা।

এ সবকিছুই অর্জিত হতে পারে যদি আপনি কুরআনের সাথে অধ্যয়ন, অনুশীলন এবং অনুধাবনের একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কে উপনীত হতে পারেন। এর বাণীসমূহের উপর গভীরভাবে ভেবে দেখা ব্যতীত আপনার হৃদয়, চিন্তা এবং আচরণ তার প্রতি সাড়া দিতে পারে না। নিজেকে কুরআনের পয়গামের চিন্ত াভাবনায় নিমগ্ন করা ব্যতীত আপনি তা গ্রহণ করতে সক্ষম নন কিংবা ঐসব বাণী আপনার জীবনে প্রবেশ করতে পারে না। একটু চিন্তা করে দেখুন, চিন্তা-ভাবনা ও অনুধাবনের প্রশ্ন যদি না থাকতো, তবে আপনাকে তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দেয়া হলো কেন? আপনাকে বিরতি দিয়ে দিয়ে কুরআন পড়তে বলা হয়েছে। আপনি কুরআনে যা পড়ছেন তা যদি না বুঝেন

তাহলে কি করে আপনি কুরআন যাতে গুরুত্ব দিয়েছে, তার প্রতি আন্তরিক, দৈহিক, মৌখিকভাবে সাড়া দিতে সক্ষম হবেন?

অধ্যয়নের বিপক্ষে যুক্তি

কিন্তু যদি কেউ অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং অধ্যয়নের যাবতীয় উপায় উপকরণে সমৃদ্ধ হওয়া ছাড়াই নিজে নিজেই আল্লাহর কিতাব বুঝার ভয়ংকর ঝুঁকিপূর্ণ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হন, তাহলে কি ভুল করার বা বিপথগামী হওয়ার আশংকা নেই? হ্যাঁ অবশ্যই এ আশংকা রয়েছে বিশেষ করে যখন আপনি সুস্পষ্টভাবে আপনার সীমাবদ্ধতা এবং লক্ষ্য সম্পর্কে জানেন না। কিন্তু যদি কুরআন বুঝার জন্য আপনি আদৌ চেষ্টা না করেন, তাহলে ক্ষতিটা অনেক বেশি আপনার জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য। কতিপয় যথার্থ সতর্কতা অবলম্বন করে নিজে নিজে কুরআন অধ্যয়নের ঝুঁকি অপসারণ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, এক্ষেত্রে কখনো আপনি আপনার সীমাবদ্ধতা এবং লক্ষ্য অতিক্রম করবেন না। কিন্তু এ ধরনের অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে যে ক্ষতি হবে, তা পূরণ করা সম্ভব নয়।

কেউ কেউ যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন যে, নিজে নিজে কুরআনের মর্ম বুঝার প্রয়াস চালানো কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসের লংঘন নয়? তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশি মতো কুরআন ব্যাখ্যা করবে, তার স্থান হবে জাহান্নাম' (জামে আত্ তিরমিযী)।

খোলা মনে আল্লাহর হিদায়াত গ্রহণের পরিবর্তে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোন ধারণা, ব্যক্তি মতামতের প্রমাণ বা সমর্থন পাওয়ার লক্ষ্যে যে অধ্যয়ন করা হয়ে থাকে, সেই ধরনের অধ্যয়ন সম্পর্কেই এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা প্রয়োজনীয় জ্ঞান নেই এমন বিষয়ে ব্যাখ্যা দানের প্রবণতাকে বুঝানো হয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম গাযযালী (রহ) দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, অন্যথায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে কুরআন বুঝার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন না, কিংবা এমন অর্থও তাঁরা করতেন না যা তাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেন নি, কিংবা তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা নিয়ে কোন মতপার্থক্যও হতো না।

ভয়ংকর পরিণতির আশংকায় অনেক ধর্মীয় নেতা বিজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া কুরআনের অনুবাদ পর্যন্ত পড়তে নিষেধ করে থাকেন। অথবা তাঁরা একাকী কুরআন অধ্যয়নের এমন সব শর্ত আরোপ করেন, যা খুব কম সংখ্যক লোকই অনেকদিন পর্যন্ত চেষ্টার পর পূর্ণ করতে পারেন। তাদের সদিচ্ছা সত্ত্বেও এ ধরনের উপদেশ প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত আপনাকে কুরআনের মহান সম্পদ থেকে বঞ্চিত করবে। তাদের আশংকা স্বাভাবিক হলেও তাদের নিষেধাজ্ঞার কোন যুক্তি বা ভিত্তি নেই।

একটু চিন্তা করে দেখুন, তাঁরা কি একজন আরবকে কুরআনের শাব্দিক অর্থ বুঝতে নিষেধ করতে পারেন? তাহলে কেন একজন অনারবের অনুবাদ পড়া উচিত নয়? তা ছাড়াও তাঁরা কি কাউকে অন্য কোন বিষয়ে পড়ে তা থেকে অর্থ অনুধাবন বা সন্ধান করা থেকে বিরত করতে পারেন? তাহলে কেন কুরআন অধ্যয়ন করে অর্থ বুঝার প্রয়াস চালাতে নিষেধ করা হবে? তাছাড়া মুসলিম ও কাফির নির্বিশেষে কুরআনের যে প্রথম অবতীর্ণ আয়াত সে সম্পর্কেই বা কি বলা যায়? তারা ছিল নিরক্ষর বণিক এবং বেদুইন, যাদের না ছিলো জ্ঞানার্জনের কোন উপায় উপকরণ। তথাপি অনেক কাফির কারও সাহায্য ছাড়াই শুধু শুনে এবং এমনকি প্রথমবার শুনেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

একথা ঠিক যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবা কিরাম (রা)-এর জীবনে কুরআনের তাৎপর্য দেখার এক অসাধারণ এবং সর্বোচ্চ সুবিধা তাদের ছিল যে, সাহাবাগণ কুরআনের পথে ঈমান, দাওয়াত ও জিহাদের কঠোর পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও সেটা আমাদের জন্য নিরুৎসাহের কারণ হওয়া উচিত নয়। আমরা যদি প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করতে সক্ষম হই, তাহলে কুরআন কেন তার দ্বার আমাদের জন্য উন্মুক্ত করবে না? এবং এক্ষেত্রে যার উপর বারবার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হলো, আমাদেরকেও সাহাবা কিরামের মতো ঈমান, দাওয়াত ও জিহাদের কঠোর পথে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

শিক্ষকের পদতলে বসা ব্যতীত কুরআন বুঝার অন্যসব প্রয়াস নিষেধ করার বিপদগামিতার বিরুদ্ধে সতর্কতা নিহিত নয় বরং সঠিক দিক-নির্দেশনা পালনের মধ্যে রয়েছে এর প্রতিকার।

এর অর্থ অবশ্য আরবী ভাষা ও বিভিন্ন উলুমুল কুরআনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন, তাফসীর পাঠ, বিজ্ঞ এবং নির্ভুরযোগ্য শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন, সমসাময়িক মানবীয় জ্ঞানের উপর দখল এসবকে অস্বীকার করা নয়। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা নির্ভর করে আপনি কুরআন অধ্যয়ন থেকে কি পেতে চান তার উপর। আপনার উদ্দেশ্য লাভের উপযোগী উপকরণ আপনার থাকতেই হবে। কিন্তু এজন্য আপনার কাছে যাবতীয় উপায়-উপকরণ নেই বলেই কিংবা আপনি কোন শিক্ষকের কাছে যেতে পারেন না বলেই কুরআন অধ্যয়নের প্রয়োজন খতম করে দিতে পারেন না।

মনে করুন আপনি একটি দ্বীপে আছেন, আপনি আরবী ভাষা জানেন না, কিংবা তা শিখার কোন সুযোগ আপনার নেই। আপনার একজন ভালো শিক্ষক অথবা একটি ভালো তাফসীর নেই, কিংবা আপনি এর কোন একটি যোগাড়ও করতে পারেন না। নিঃসন্দেহে এমন পরিস্থিতিতে শুদ্ধভাবে কুরআন বুঝার সামর্থ্য অর্জনের প্রয়োজনীয়তা আপনার স্বীকার করা উচিত এবং এ জন্য যাবতীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তথাপি কুরআন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য হিদায়াত স্বরূপ।

সৌভাগ্যবশত আমরা কেউই এমন দ্বীপের অধিবাসী নই। অনুরূপ দ্বীপের অস্তিত্ব আমাদের কল্পনায় প্রধানত আমাদের অকর্মণ্যতা এবং অলসতা, অমনোযোগিতা ও নিস্ক্রিয়তার জন্য অথবা কুরআন বুঝার জন্য কুরআনের সাহচর্য হচ্ছে আমাদের হৃদয় ও মনের জন্য তেমন অত্যাবশ্যক, যেমনটি দেহের জন্য খাদ্যের। যা স্মরণ রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে, বাস্তবিকই কেউ যদি একটি দ্বীপে বাস করেন এবং তার হাতে একটি মাত্র কুরআনের কপি থাকে এবং তার শাব্দিক অর্থ তিনি কোনমতে বুঝেন, অথবা কেউ কুরআনের বিধিগুলো আয়ত্ত করেছেন তথাপি ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের উপর গভীর চিন্তা গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করার প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা থেকেই যায়।

কুরআনিক বৈশিষ্ট্য

কুরআন হচ্ছে প্রত্যেকের জন্য হিদায়াত, তার শিক্ষক এবং বিজ্ঞ পরামর্শদাতা। অতএব, এটি বুঝার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় এটি রহস্যের প্রতীক

ব্যতীত আর কিছুই নয়। কুরআনের আহ্বানের প্রতি হৃদয় ও মনকে উন্মুক্ত করার জন্য চেষ্টা-সাধনার গুরুতর কেন্দ্রিকতা, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সম্পর্কে কুরআন সুস্পষ্ট কথা বলেছে। কুরআন বুঝার ব্যাপারে আমাদের হৃদয় ও মনকে তালাবদ্ধ করে রাখার ত্রুটি আমাদের রয়ে গেছে।

তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে নাই?

বা তাদের দিলসমূহে তালা পড়ে গিয়েছে? (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২৪)

অতএব, কুরআন বুঝার প্রতি আহ্বান কুরআনের প্রায় প্রতি পাতায় ছড়িয়ে আছে। কেন আপনি শুনবেন না? কেন দেখবেন না? কেন চিন্তা করবেন না? কেন আপনি বিচার-বিবেচনা করবেন না? কেন অনুধাবন করবেন না? কেন আপনি হৃদয়ে গ্রহণ করবেন না? যদি মানুষের প্রতি না হবে যাদের শোনার, দেখার এবং চিন্তা করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা আছে, তাহলে কার প্রতি এ আহ্বান?

এটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, বুঝার জন্যই কুরআন পাঠানো হয়েছে।

এটি এক বরকতময় কিতাব, (হে নবী!) আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন এই লোকেরা এর আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন লোকেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে (সাদ ঃ ২৯)।

অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদ তাদেরকে মহান করুণাময়ের সত্যিকারের গোলাম বলে প্রশংসা করেছে ঃ

যাঁদেরকে তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হলো, তারা তাঁর উপর অন্ধ ও বধির হয়ে পড়ে থাকেন না (আল ফুরকান ঃ ৭৩)।

পক্ষান্তরে তাদেরকে পশুর চেয়ে অধম বলে ভর্ৎসনা করে, যারা তাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তরকে কুরআন শ্রবণ, দর্শন ও বুঝার জন্য কাজে লাগায় না ঃ

তাদের দিল আছে, কিন্তু তার সাহায্যে তারা চিন্তা-ভাবনা করে না। তাদের চক্ষু

আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না। তাদের শ্রবণশক্তি আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শুনতে পায় না। তারা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মতো, বরং তা থেকেও অধিক বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফলতির মধ্যে নিমগ্ন (আল আরাফ ঃ ১৭৯)।

আপনি কুরআনের সত্যিকারের রহমত সম্পদ আহরণ করতে পারেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি এর অর্থ বুঝেন, আল্লাহ আপনাকে কি বলেছেন তা যতক্ষণ না বুঝেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে তা খুঁজে বের করতে নিয়োজিত করতে পারেন।

পূর্ব যুগের চর্চা

যে হাদীস তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করতে নিরুৎসাহিত করেছে, তাতেও স্পষ্টভাবে বুঝার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করা হয়েছে। তখন তুমি তা বুঝতে পারবে না। যিনি অর্থ বুঝেন না, তার এ নির্দেশের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। ইমাম আল-গাযযালী (রহ) তাঁর গ্রন্থ ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীনে-এ সম্পর্কে অনেক উদাহরণ দিয়েছেন যে, সাহাবাগণ কিভাবে কুরআন অধ্যয়ন-অনুধাবনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতেন।

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, "একজন প্রায়ই কুরআন তিলাওয়াত করেন, কিন্তু কুরআন তাকে অভিশাপ দেয়, কারণ সে কুরআন বুঝে না"। আবদুল্লাহ ইবন উমারের (রা) মতে ঈমানের চিহ্ন হচ্ছে কুরআন বুঝা। আমরা দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছি...এমন এক সময় এসেছে যখন আমি দেখি একজন লোককে সমস্ত কুরআন দেয়া হয়েছে তার ঈমান আনার আগেই, তিনি সূরা আল ফাতিহা থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত সবগুলো পাতাই পাঠ করেন অথচ তিনি জানেন না কুরআনের নির্দেশ, এর সতর্কবাণী, ঐসব স্থানও চিনেন না যেখানে তাকে বিনয়ী হতে হয়। সে এটা ফেলে দেয় যেমন করে পলায়নকালে কেউ কোন কিছুকে দ্রুত ফেলে চলে যায়, সেভাবে। হযরত আয়িশা (রা) একদিন শুনলেন, একজন লোক কুরআনের সামনে বিড়বিড় করছে এবং বললেন, লোকটি না কুরআন পাঠ করছেন, আর না চুপ থাকছেন। হযরত আলী (রা) বলেন, কুরআন অধ্যয়নে কোন কল্যাণ নেই যদি তা নিয়ে ভাবা না হয়, চিন্তা করা না হয়। আবু সুলাইমান আদ-দারানী বলেন, আমি একটি আয়াত পড়ি এবং তা নিয়েই চার-

পাঁচ রাত্রি কাটাই এবং পরবর্তী আয়াত পড়ি না যতক্ষণ পর্যন্ত এর উপর আমার চিন্তা-ভাবনা শেষ না হয়।

স্বাভাবিকভাবেই যদি কুরআন সব মানুষের জন্য হিদায়াত গ্রন্থ হয়ে থাকে, তাহলে একটি দ্বীপবাসী মানুষ এর হিদায়াত যতটা গ্রহণ করতে পারে ততটাই পারে সেই ব্যক্তি যিনি জ্ঞান চর্চায় নিমগ্ন। যদি এজন্য কোন বই বা শিক্ষক নাও থাকে, তাহলেও এটা আপনাকে পরিষ্কারভাবে জানতে হবে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে এটা বুঝার জন্য, এর উপর চিন্তা-ভাবনার জন্য, আপনার জীবনের জন্য এর অর্থের অনুসন্ধান এবং আপনাকে কুরআন কি বলে তা জানার জন্য আপনাকে সময় নিয়োজিত করতে হবে।

ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ঝুঁকি

এ ধরনের উদ্যোগে যে ঝুঁকি রয়েছে, তা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত হওয়া উচিত এবং তা থেকে বাঁচার জন্য যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। আপনি কতিপয় দিক-নির্দেশ মেনে এ ঝুঁকি এড়াতে পারেন নিশ্চিতভাবে ঃ

(১) মনে রাখতে হবে কুরআন বুঝা একটি ব্যাপক ও বহুমুখী প্রক্রিয়া। এর রয়েছে বিভিন্ন ধরন, দৃষ্টিকোণ, পরিমাণ ও স্তর। আপনাকে এর সবই জানা উচিত। হৃদয়ের পরিচর্যার জন্য বুঝা আর ধর্মীয় বিধান বের করার জন্য বুঝার মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য।

(২) নিজের অবস্থা মূল্যায়ন এবং অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে আপনার সীমাবদ্ধতা ও সামর্থ চিহ্নিত করুন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ কুরআনের হিদায়াত বা নির্দেশিকা সম্পর্কে আপনার উপলব্ধি, আরবী বুঝার ক্ষমতা, হাদীস ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবন চরিত্রের উপর দখল, উৎসসমূহে প্রবেশের ক্ষমতা।

(৩) আপনার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বুঝুন এবং আপনার অধ্যয়নের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। কোন অবস্থাতেই আপনার সীমাবদ্ধতা ও সামর্থ্যের বাইরে যাবেন না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ আপনি যদি আরবী ভাষা না জানেন, ব্যাকরণগত ও

আভিধানিক বিষয়ে গভীর গবেষণা করবেন না, নিজেকে সরাসরি শাব্দিক অর্থের মধ্যে সীমিত রাখুন। আপনার যদি অবতীর্ণ বা রদ হওয়া সম্পর্কে, প্রথম যুগের ফকীহ্দের রচনা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে, তবে কুরআন থেকে আপনার নিজস্ব ফিকাহ্ উদ্ভাবন শুরু অথবা কোন বিশেষ মতকে সমালোচনা বা সমর্থন করা আপনার উচিত হবে না।

(৪) আপনার অনুসন্ধানলব্ধ কোন বিষয় যা উম্মাতের সাধারণ ঐকমত্যের বিরোধী এমন কোন কিছুকে চূড়ান্ত মনে করবেন না বা প্রচারও শুরু করবেন না। এটা আপনার কোন মত পোষণের বিরোধিতার জন্য নয় কিংবা বিজ্ঞজনের মতামত ভুল নয় একথা সমর্থন করার জন্যও নয় বরং এজন্য যে, কোন মতের বিরোধিতা করতে হলে বেশি না হলেও কমপক্ষে সমান গুণের অধিকারী হতে হবে।

এটা না আপনাকে দায়িত্বমুক্ত করতে পারে সেই কাজ করা থেকে, যা আপনি কুরআন থেকে সঠিক বলে জানেন এব সেই কাজ এড়িয়ে চলতে যা সঠিক নয়।

(৫) যখনই আপনি নিজ উপসংহার সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হবেন আপনার সীমিত জ্ঞানের কারণে, যা আপনি প্রায়শই হবেন, আপনার মতামতকে সন্দেহের মধ্যেই রাখুন যতক্ষণ না আপনি পূর্ণ তুলনামূলক অধ্যয়ন করছেন বা বিশ্বস্ত কুরআনের সুযোগ্য বিজ্ঞ পণ্ডিতের সাথে তা আলোচনা করছেন।

বুঝার শ্রেণী বিভাগ

মুটামুটিভাবে আমরা কুরআন অধ্যয়নকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

(১) তাযাক্কুর ও (২) তাদাব্বুর। যেমনটি উল্লেখ্ করা হয়েছে ঃ

যেন এই লোকেরা এর আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন লোকেরা এ থেকে সবক গ্রহণ করে (সাদ ঃ ২৯)।

তাযাক্কুর

তাযাক্কুর শব্দটি কুরআন শরীফে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, বিভিন্ন রকম অনুবাদও করা হয়েছে। যেমন ঃ উপদেশ গ্রহণ, উপদেশ আহরণ, স্মরণ করা,

মনোযোগী হওয়া, হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করা। অতএব, এটা এমন এক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে আপনি কুরআনের সাধারণ পয়গাম এবং শিক্ষা হৃদয়ংগম করতে পারেন। এ পয়গাম আপনার জন্য কি অর্থ বহন করে এবং আপনার প্রতি তার দাবী কি আপনি তা উপলব্ধি করতে পারেন। এসব আপনি হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করুন হৃদয় ও মনের উন্মুক্ত সাড়া আনার জন্য। যা আপনি পান সে অনুযায়ী ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগান এবং পরিশেষে কি বাণী অন্য মানুষের সামনে আপনি উপস্থাপন করবেন, তা নির্ধারিত করুন।

তাযাক্‌কুর হচ্ছে সেই এক ধরনের বুঝ, যা তার প্রয়োজনীয় প্রকৃতিতেই এমন যে, সেজন্য খুব উন্নতমানের পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন পড়ে না। আপনি প্রতিটি শব্দের অর্থ জানতে নাও পারেন। সকল গুরুত্বপূর্ণ ও মূল শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে হয়তো আপনি সক্ষম নন, আপনি প্রতিটি আয়াতের অর্থ নাও জানতে পারেন কিন্তু সাধারণ, সামগ্রিক ও বিশেষ পয়গাম, কিভাবে আপনি জীবন যাপন করবেন তা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছভাবে জানা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে যারা কুরআন সবচাইতে বেশি বুঝেছিলেন এবং উপকৃত হয়েছিলেন কুরআন থেকে, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এর প্রথম শ্রোতাগণ- তারা ছিলেন ন্যায় ব্যবসায়ী, কৃষক, মেষপালক, উষ্ট্র চালক এবং বেদুইন। তাদের হাতের নাগালের মধ্যে ছিল না কোন অভিধান তা তাফসীর-গ্রন্থ আর না ছিল স্টাইল, রচনাশৈলী, ছন্দ, অলংকার শাস্ত্রের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থাবলী। আর না তারা দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, নৃবিদ্যা, অথবা সামাজিক ও ভৌতিক বিজ্ঞানের সকল জ্ঞানের অধিকারী। এতদ্‌সত্ত্বেও কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে তারা ছিলেন সবচাইতে সফল। এর কারণ হচ্ছে, তারা কুরআনের বাণীকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন শুরু করেছিলেন। সেক্ষেত্রে যারা প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করেন, তাদের এমন ধরনের বুঝই হয় এবং এমন বুঝই তাদের প্রত্যেকেই পেতে পারে। কি পরিমাণে বা মাত্রায় তিনি গ্রহণ করতে পারেন তা নির্ভর করে তার উদ্যোগ এবং সামর্থ্যের উপর। অবশ্যই পাণ্ডিত্যের উপায়-উপকরণ এ প্রক্রিয়ায় অনেক নতুন দিক সংযোজন করে, গুরুত্ব বৃদ্ধি করে, নতুন দূরদৃষ্টি দান করে কিন্তু এসব অবশ্যই লাগবে এমন নয়।

তাযাক্কুরের অর্থ হলো কুরআন পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে যে, এটা বুঝা অতি সহজ। কুরআন প্রতিটি আন্তরিক অনুসন্ধানীর নাগালের মধ্যেই যদি তিনি শুধু উপলব্ধি করেন যে, তিনি কি পাঠ করছেন এবং তার উপর চিন্তা-ভাবনা করেন। আর তাযাক্কুর মানে কুরআন তাদের তদনুযায়ী পরিচালিত হতে আহ্বান জানায়, যারা শুনতে পারে, দেখতে পারে ও চিন্তা করতে পারে। এটা এই অর্থে যে ঃ

আমরা এই কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। এ হতে উপদেশ গ্রহণের কেউ আছে কি (আল কাসাস ঃ ১৭)?

হে নবী! আমরা এই কিতাবকে তোমার ভাষায় খুব সহজ বানিয়ে দিয়েছি। যেন এই লোকেরা নসীহত গ্রহণ করে (আদ্ দুখান ঃ ৫৮)।

আমরা এই কুরআনে লোকদের সম্মুখে নানা রকম ও নানা প্রকারের দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করেছি, যাতে এদের হুঁশ হয় (আয্ যুমার ঃ ২৭)।

এতে অত্যন্ত শিক্ষামূলক সবক রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যার দিল আছে কিংবা যে খুব লক্ষ্য দিয়ে কথা বলে (কাফ ঃ ৩৭)।

তাযাক্কুর কোন নিম্নস্তরের বুঝ নয়, এটি হচ্ছে কুরআনের মূল অপরিহার্য উদ্দেশ্য। আলো ও পথ-নির্দেশনা লাভের জন্য এবং তাযাক্কুরের মাধ্যমে নিরাময় লাভের নিমিত্ত আপনাকে সারাটি জীবন সংগ্রাম করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় আপনাকে ব্যক্তিগত অসংখ্য ফায়দা হাসিলের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

তাদাব্বুর

তাদাব্বুর ভিন্ন ধরনের উপলব্ধি। এর তাৎপর্য হচ্ছে, প্রত্যেকটি শব্দ, আয়াত এবং সূরার পুরো অর্থ জানার চেষ্টা, শব্দসমূহ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, রূপকসমূহের অন্তর্নিহিত অর্থের অনুসন্ধান করা, মূল পাঠের সুসংগতি ও অন্তস্থিত ঐক্য আবিষ্কার করা, কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা, আভিধানিক জটিলতাসমূহ অবতরণ ও ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপর গভীর গবেষণা, বিভিন্ন তাফসীরের

তুলনামূলক অধ্যয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা। অতঃপর মানুষের সাথে তার আল্লাহর, তার সহযোগী অন্য মানুষের, তার নিজের সত্তার, তার পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে সম্পর্কের সকল তাৎপর্য আবিষ্কার করা, ব্যক্তি ও সমাজের জন্য আইন ও নৈতিকতা, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির বিধানসমূহ, ইতিহাস ও দর্শনের মূলনীতিসমূহ উদ্ভাবন করা এবং মানব জ্ঞানের বর্তমান স্তরের তাৎপর্য অনুধাবন করা।

এ ধরনের অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে বিভিন্ন উলূমুল কুরআনের ব্যাপক ও গভীর জ্ঞানের এবং এটাও নির্ভর করে আপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর।

তাদাব্বুর এবং তাযাক্কুর সম্পূর্ণরূপে পৃথক নয় বা কুরআন বুঝার পারস্পরিক স্বতন্ত্র কোন প্রক্রিয়াও নয়। একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত।

আপনার লক্ষ্য

আপনার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্য ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্ন হবে এমন কি কারও জন্য সময় থেকে সময়ে ভিন্ন হতে পারে। আমার মতে তাযাক্কুর প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্যকরণীয়, যারা কুরআন বুঝতে সক্ষম।

সুতরাং একজন সাধারণ শিক্ষিত মুসলিম যিনি তার সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতার আলোকে আল্লাহর প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূরণের চেষ্টা করছেন, তার তাযাক্কুরই হওয়া উচিত প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। চিরদিন আপনি এর সাথেই থাকবেন এবং কোন সময়ই এমন পর্যায়ে পৌঁছবেন না, যাতে আপনি তাযাক্কুর থেকে বিরত হতে পারেন।

আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে- তাযাক্কুরে আপনি অবশ্যই আপনার মন ও হৃদয়ের যত্ন নিবেন, ঈমান বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন আপনার প্রতি কুরআনের পয়গামকে আবিষ্কার করতে ব্রতী হবেন, হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে এবং মুখস্থ করতে চেষ্টা করবেন। আপনার সমস্ত শ্রমের মাধ্যমে আপনার উচিত হবে আল্লাহর কণ্ঠ শুনতে সক্ষম হওয়া! তিনি আপনাকে কি হতে বলেন বা কি করতে বলেন!

বুঝের স্তর ও রকম

আপনার কুরআন বুঝাটা বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে।

প্রথম ঃ আপনি আপনার জানা ভাষায় কোন বই পড়লে তার সহজ এবং আক্ষরিক অর্থ উপলব্ধি করতে যেভাবে সক্ষম হন অথবা যেমন আরবী জানা কোন লোক যেভাবে কুরআন বুঝতে পারে। এমন বুঝ বা উপলব্ধি হতে পারে সর্বনিম্ন প্রয়োজন। এটি হবে অন্য সব স্তরে পৌঁছার চাবিকাঠি, কিন্তু এটাই পর্যাপ্ত নয়।

দ্বিতীয় ঃ আপনি এটি বের করেন যে, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কিভাবে এটা বুঝেছেন, হয় তাদের বর্ণনা শুনে অথবা ব্যাখ্যা পড়ে এবং অন্যান্য উৎস থেকে।

তৃতীয় ঃ আপনি নিজে নিজেই অধ্যয়ন করুন এবং চিন্তা-ভাবনা করুন কুরআনের অর্থ আবিষ্কার করার জন্য এবং আত্মস্থ ও তাযাক্কুর অর্জন করার জন্য। যদি আপনার যোগ্যতা ও চাহিদা থাকে, তাহলে তাদাব্বুরও অর্জন করতে পারবেন।

চতুর্থ ঃ আপনি এর অর্থ আবিষ্কার করুন এর বাণী মেনে এবং কুরআন যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও মিশন আপনার উপর ন্যস্ত করেছে, তা পূরণ করে।

মৌলিক শর্তাবলী

আপনার প্রয়াস ফলপ্রসূ করার জন্য কতিপয় মৌলিক শর্ত পূরণ করা উচিত।

এক ঃ আপনাকে এতটুকু আরবী শিখা উচিত যাতে আপনি অনুবাদের সাহায্য ছাড়াই কুরআনের অর্থ বুঝতে পারেন। এটি হচ্ছে প্রাথমিক স্তর এবং এর সবচাইতে প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। এটা খুব কঠিন কাজ মনে হতে পারে। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি অর্ধশিক্ষিত লোকও গভীর নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে এ কাজ সম্পাদন করেছে। একজন শিক্ষক কিংবা একটি ভালো বইয়ের সহযোগিতা পেলে কুরআন বুঝার জন্য পর্যাপ্ত আরবী শিখতে আপনার ১২০ ঘন্টার বেশি সময় লাগার কথা নয়। কিন্তু আরবী শিক্ষার জন্য এ পরিমাণ সময় না পাওয়া পর্যন্ত কুরআন অধ্যয়নের প্রচেষ্টা বন্ধ করবেন না।

একটি ভালো অনুবাদ-গ্রন্থ নিন এবং আপনার প্রয়াস শুরু করুন। না বুঝে কুরআন তিলাওয়াতের চাইতে এটা উত্তম।

সমস্ত কুরআন পড়া

দুই ঃ প্রথমে সমস্ত কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সরাসরি আক্ষরিক অর্থ বুঝে পড়ুন। যদি আপনি আরবী না জানেন একটি অনুবাদ ব্যবহার করুন।

কমপক্ষে এক মাসের মধ্যে একটি প্রথম পাঠ সমাপনের জন্য আপনার একটি বিশেষ প্রকল্প তৈরি করা উচিত। এ জন্য দৈনিক দুই ঘন্টার বেশি সময় লাগা উচিত নয়। এরপর আপনি ধীরে-সুস্থে পড়ার একটি পরিকল্পনা করতে পারেন যা আপনার সুবিধাজনক হয়। কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এ ধরনের পড়া সারা জীবন অব্যাহত রাখতে হবে তা যেভাবেই আপনার জন্য সুবিধাজনক হোক না কেন, যেমনটি আপনি ইতোমধ্যেই কুরআন অধ্যয়ন-বিধি থেকে জেনেছেন।

গভীরভাবে অধ্যয়নে যাবার আগে গোটা কুরআনের একটি প্রাথমিক পাঠ অত্যন্ত জরুরী। এটি আপনাকে কুরআনের সামগ্রিক বাণী সম্পর্কে অবহিত করবে, এর রচনাশৈলী, বাচনভঙ্গি, যুক্তি ও রূপক সম্পর্কে এবং এর শিক্ষা ও বিধি সম্পর্কে কিছু ধারণা দিবে। নিয়মিত তিলাওয়াত করে আপনি কুরআনের সাথে পরিচিত হয়ে যান, এর সুসংগতি ও সংহতি সম্পর্কে অনুভব করুন এবং এটিকে একটি সামগ্রিক জিনিস হিসেবে দেখতে শুরু করুন। এতে কুরআনের সাধারণ কাঠামোর বাইরে কোন কিছু ব্যাখ্যায় বিপদ কম হবে। কুরআনের বিষয়বস্তু ও মূল পাঠের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ছাড়াই যারা সূচী বর্ণনাক্রম অনুযায়ী কুরআনের নিকট যান, তাদের ভুল হবার বা ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার সমূহ আশংকা থেকে যায়।

নিয়মিত কুরআনের মূল পাঠের সাথে সম্পর্ক রাখা কুরআন বুঝার এক অপরিহার্য চাবি। এটি ব্যাপক সাহায্যে আসবে এমনকি শব্দ বা আয়াত বুঝার ক্ষেত্রেও। কুরআনের সাথে দীর্ঘস্থায়ী এবং অব্যাহত সাহচর্য দানের মাধ্যমে আপনি দেখবেন অনেক সময় এমন মূল পাঠের সামনে এসেছেন যেন হঠাৎ করে মনে হচ্ছে তা যেন আপনার সাথে কথা বলছে এবং আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

অবশ্য কোন এক সময় আপনি বিভিন্ন লক্ষ্য হাসিলের জন্য বিভিন্নভাবে

কুরআনের মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছেন। আপনি দ্রুতপঠন প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে পারেন অথবা নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারেন, অথবা একটি শব্দ বা একটি আয়াতের অর্থ পাওয়ার জন্য অর্থের উপর চিন্তা করার জন্য আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লাগাতে পারেন। আপনি একটি অনুচ্ছেদ বারবার পাঠ করতে পারেন। কখনো দ্রুত বা কখনো আস্তে। অথবা একটি বিশেষ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা নেবার জন্য আপনি পৃষ্ঠাগুলোর উপর মাত্র নজর বুলিয়ে যেতে পারেন, যার সাথে আপনার আগেরই একটি পরিচিতি রয়েছে। আপনি নিজে নিজেই চিন্তা করতে থাকতে পারেন যা কম সময় নেবে, অথবা আপনি একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন করতে চান বিভিন্ন তাফসীর অনুযায়ী যার একটি ক্ষুদ্র অংশও আপনার দীর্ঘ সময় লাগিয়ে দিতে পারে।

তাফসীর পাঠ

তিন ঃ বুঝে-শুনে সমগ্র কুরআন মাজীদ একবার খতম করার পর আপনি নিয়মিত যতটুকু সম্ভব ধীরগতিতে তা পড়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় আপনি একটি সংক্ষিপ্ত অথচ নির্ভরযোগ্য তাফসীর বা অনুবাদ নিন এবং তা আগাগোড়া পড়ে ফেলুন। খুব কম সংখ্যক সংক্ষিপ্ত তাফসীরই আরবী, উর্দু ও অন্যান্য মুসলিম ভাষায় পাওয়া যায়। যদিও বা বর্তমান ইংরেজী ও ইউরোপীয় ভাষায় এসবের খুবই অভাব। যা হোক, যাই পাওয়া যায় না কেন, তা লাভজনকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে, যদি সতর্কভাবে পড়া হয়।

নিজে নিজে পড়ার চাইতে একটি সংক্ষিপ্ত তাফসীর পাঠও কুরআন সম্পর্কে আপনাকে অনেক বেশি বিস্তারিত ধারণা দিতে সক্ষম। তাফসীর আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন ভাষা, স্টাইল, যুক্তি, ঐতিহাসিক পটভূমি, বিস্তারিত অর্থের সাথে পরিচিত করাবে, যা আপনার নিজের চিন্তায় অনুসন্ধান লাভ সম্ভব নয়। এটি আপনার কিছু ভুলকেও সংশোধন করতে পারে।

যখনই আপনি বিস্তারিত কুরআন অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তখনই নিজেকে সংক্ষিপ্ত তাফসীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করুন। কমপক্ষে প্রাথমিকভাবে কখনও দীর্ঘ, বিস্তারিত গবেষণামূলক তাফসীর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন না। প্রায়ই তাদের দীর্ঘ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আল্লাহর বাণীর

সাথে আপনার জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। আংশিক তাফসীর পড়ুন, যদি পূর্ণ তাফসীর পাওয়া না যায়। যখন ইসলামের উপর কোন সাহিত্য পড়েন, তখনও অধ্যয়নকালে বা উপসংহারে কুরআন কেন্দ্রিক যা পান, তার বিশেষ একটি নোট তৈরি করুন। এমনকি ব্যাপকভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের কাজ আপনার কুরআন বুঝার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় সাহায্যে পরিণত হতে পারে।

মনে রাখবেন, ঈমানের পুষ্টি সাধন এবং কিভাবে জীবন যাপন করবেন তার প্রয়োজনীয় বাণী বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই আপনি পাবেন। কেবল কিছু সন্দেহ-সংশয় দূর করার জন্য, একটি চমৎকার বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য, একটি জটিল জট খোলার জন্য আপনার তাফসীরের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।

নির্ধারিত অংশ অধ্যয়ন

চার ঃ আদর্শ হিসেবে আপনাকে প্রথম থেকেই কুরআন অধ্যয়ন শুরু করে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে। একদিন অবশ্যই আসবে, আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ এমন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

কিন্তু আমাদের অধিকাংশের জন্যই এমন দিন আসাটা সুদূর পরাহত কিংবা কোনদিন হয়তো আর আসবে না। এমতাবস্থায় আপনার অধ্যয়ন শুরু করা উচিত যত শীঘ্র সম্ভব।

তখন এ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত অংশ, অনুচ্ছেদ, সূরা অথবা আয়াত নিন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে পাঠ করুন। কোন কোন সময় আপনার নিজের দাওয়াতী তৎপরতায় জড়িত থাকার কারণে এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য আপনি বিশেষ অংশ অধ্যয়ন করতে বাধ্য হন। কোন কোন সময় আপনার নিয়মিত অধ্যয়নও আপনাকে বিশেষ বিশেষ অনুচ্ছেদের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারে, যা আপনি গ্রহণ করতে পছন্দ করেন। কিন্তু আপনি একটি বৈজ্ঞানিক ও সুশৃংখল সিলেবাসও অনুসরণ করতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শুরু করা এবং কিভাবে অধ্যয়ন করতে হবে তা জানা, কি দিয়ে শুরু করতে হবে তা নয়। এই বইয়ের শেষে কিছু অনুচ্ছেদের তালিকা পরামর্শ হিসেবে দেয়া হয়েছে।

অধ্যয়ন শুরু করার জন্য নির্ধারিত অনুচ্ছেদ বিভিন্নভাবে আপনার অনেক উপকারে আসবে। প্রথম ঃ আপনি অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করার চাইতে তাযাক্কুরের অতীব প্রয়োজনীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কুরআনের ভুবনে সফরের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে অগ্রগতির সূচনা করবেন। দ্বিতীয় ঃ আপনি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র, কুঞ্জিকা এবং পদ্ধতিসমূহ পেয়ে যাবেন, যা আপনাকে কুরআনের ঐসব অংশ বুঝতে সহায়তা করবে, যা আপনি খুব সহসাই বিস্তারিতভাবে পড়ার সুযোগ পাবেন না। কুরআন বিভিন্নভাবে তার বক্তব্য প্রকাশ করে থাকে। আল্লাহ এক অতি উত্তম কালাম নাযিল করেছেন। এটি এমন এক কিতাব যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যাতে বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে (যুমার ঃ ২৩)। তৃতীয় ঃ আপনাকে কুরআনিক কাঠামোর একটি পূর্ণরূপ বা চিত্র গড়ে তুলতে হবে, যা আপনার উপলব্ধিকে সঠিক পথে রাখার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। চতুর্থ ঃ অন্যদের কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছতে আপনি উত্তমভাবে সুসজ্জিত হয়ে যাবেন।

নির্ধারিত অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত অধ্যয়ন কোনক্রমেই সাধারণ পাঠের বিকল্প হতে পারে না। এর কল্যাণকারিতাই ভিন্ন প্রকৃতির এবং গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, নিয়মিত কুরআন পাঠ বা দীর্ঘ অংশ পড়া বাদ দিবেন না। বিস্তারিত পড়া এবং গোটাটার অবহেলা আপনাকে বিভ্রান্তিতে নিক্ষিপ্ত করতে পারে।

বারবার পড়া

পাঁচ ঃ যে অংশটুকু আপনার অধ্যয়নের জন্য আপনি নির্দিষ্ট করে থাকুন না কেন, আপনাকে তা বারবার পড়তে হবে। এটাকে একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করে তা সর্বদা অনুসরণ করতে হবে। এর সাথে থাকুন, এর অনুসারে চলুন যতটা পারা যায়, এটা নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন এবং একে আপনার হৃদয় ও মন দিয়ে গভীরভাবে ভাবতে দিন। এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী সাহচর্য কুরআন বুঝার এক অপরিহার্য অবলম্বন। কুরআনের বাণীসমূহ আপনার হৃদয়ে যতখানি গেঁথে যায়, যত বেশি বারবার তা আপনার ঠোঁটে উচ্চারিত হয়, ততই সহজ হবে আপনার জন্য কুরআনের প্রতি মনোযোগী ও ধ্যানমগ্ন হওয়া। তখন শুধু তিলাওয়াতের সময় বা অধ্যয়নের সময়ই নয় বরং আপনার প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে

কুরআন আপনার কাছে তার অর্থ খুলে দেবে যখনই কোন আয়াত বা শব্দ আপনার মনে উদয় হবে।

অনুসন্ধিৎসু মন

ছয় ঃ একটি কৌতুহলী মন, অনুসন্ধিৎসু আত্মা, অর্থের জন্য উন্মুখ একটি হৃদয় তৈরি করুন। আপনি জানেন যে, কুরআন কখনও অন্ধবিশ্বাস চায় না, এটাও চায় না যে, আপনি চোখ-কান বন্ধ করে তালা লাগিয়ে কুরআন পাঠ করুন। চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আহ্বান জানানো এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক বিষয়বস্তু।

প্রশ্ন করা, স্মরণ করা জ্ঞান ও বুঝের চাবিকাঠি। অতএব, যত বেশি প্রয়োজন মনে হয় ততো বেশি প্রশ্ন উত্থাপন করুন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই শব্দ বা আয়াতের আক্ষরিক অর্থ কি? অন্য আর কি অর্থ হতে পারে? ঐতিহাসিক পটভূমিকা কি, কোন্ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে? প্রতিটি শব্দ, বাগধারা ও বাক্যের মূল পাঠ কি? এটি কিভাবে আসে ও পরের বাক্যের সাথে সংযুক্ত? কিভাবে অভ্যন্তরীণ শৃংখলা ও বিষয়বস্তুগত ঐক্য উপলব্ধি করা যেতে পারে? কি বলা হয়েছে? কেন বলা হয়েছে? সাধারণ এবং বিশেষ অর্থই বা কি? প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ কি? কেন্দ্রীয় ভাবধারা কি? আমার জন্য/আমাদের জন্য এখন কি সংবাদ আছে? অধ্যয়নকালে আপনি আপনার প্রশ্নগুলো নোট করুন এবং তার জবাব খুঁজে বের করতে চেষ্টা করুন।

প্রশ্ন উত্থাপন করতে ভয় করবেন না। প্রশ্নগুলোর জবাব সহসা অথবা কখনও আপনি নিজে অথবা কারো সঠিক সাহায্য নিয়ে না পেতে পারেন। তাতে কিছু যায় আসে না। যে উত্তরই আপনি পান না কেন, তা আপনার জন্য লাভজনক। আপনার কিছুই ক্ষতির কারণ হবে না যদি আপনি কিছু নিয়ম মেনে চলেন। প্রথমত ঃ এমন প্রশ্ন করবেন না, যা মানুষের আয়ত্তের বাইরে, যা মুতাশাবিহাতের অন্তর্গত (আলে ইমরান ঃ ৭)। যেমন ঃ আরশ কেমন? দ্বিতীয়ত ঃ চুলচেরা বিষয়কে প্রশ্রয় দিবেন না। আপনার জীবনপথের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এমন বিষয়ে কোন প্রশ্ন করবেন না। তৃতীয়ত ঃ এমন উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবেন না, যার ভিত্তি যথাযথ প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা সুস্থ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

চতুর্থত ঃ অনেক প্রশ্ন আছে, যার উত্তর আপনি খুঁজে পাবেন না, আপনার সর্বোত্তম চেষ্টা সত্ত্বেও যা আপনি বুঝবেন না। কিছু সময়ের জন্য আপনি সেসব প্রশ্ন বাদ রেখে কুরআনের অন্য বিষয়ের উপর মনোনিবেশ করুন। এক সময় আপনি একজন ভালো শিক্ষক অথবা বই পেয়ে যাবেন সে ব্যাপারে আপনার সাহায্যের জন্য। অথবা আপনি নিজেই এক সময় উত্তরটি পেয়ে যাবেন। কুরআনে এর অসংখ্যা প্রমাণ রয়েছে যে, এর প্রথম বিশ্বাসীগণ কিভাবে প্রশ্ন করতেন, সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষণীয় কতিপয় ঘটনা যেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তার সাহাবাগণ (রা) জিজ্ঞাসাবাদ, কৌতুহল, প্রশ্ন ও চিন্তা-ভাবনায় উৎসাহিত করেছেনে।

অধ্যয়নের জন্য সহায়ক

সাত ঃ কিছু সহায়িকা রয়েছে, যা আপনার অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজন হবে।

এগুলো আয়ত্তে আনার চেষ্টা করুন যতটা আপনার পক্ষে সম্ভব।

(১) আপনার নিজ ভাষায় একটি কুরআনের অনুবাদ সংগ্রহ করুন। এটি হচ্ছে আপনার নূন্যতম প্রয়োজন। সাধারণ পড়া এবং অধ্যয়ন উভয় ক্ষেত্রেই আপনাকে এটি ব্যবহার করতে হবে। একই কপি আপনি মুখস্থ করার জন্য কাজে লাগাতে পারেন যদি এটি নিয়ে চলাফেলার সুবিধা থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে যত্নবান হন যে, সারা জীবন মুখস্থ করার জন্য আপনি যেন একই কপি ব্যবহার করেন। অন্যথায় পুনঃপঠন অসুবিধাজনক হয়ে থাকে।

মনে রাখবেন যে কোন অনুবাদই পারফেক্ট বা নিখুঁত নয়। প্রত্যেক অনুবাদেই রয়েছে অনুবাদকের নিজস্ব ব্যাখ্যার অংশবিশেষ। কুরআনের কোন প্রামাণ্য হিসেবে গৃহীত অনুবাদ নেই এবং তা হওয়াও সম্ভব নয়।

(২) একই কপি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সম্বলিত হতে পারে, অথবা আপনি আলাদাভাবে একটি সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু একটি আপনার থাকতেই হবে। একটি অনুবাদ এবং একটি নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ আপনার প্রাথমিক প্রধান উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

(৩) পণ্ডিতগণ শব্দ ও মূল বিষয়বস্তুর কি ভিন্ন অর্থ করেছেন তা জানার জন্য একাধিক অনুবাদ এবং তাফসীর গ্রন্থ আপনার জন্য কাজে লাগবে যদিও বা তা থাকাটা জরুরী নয়।

(৪) আরও উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য আপনার কাছে কমপক্ষে একটি বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ থাকা উচিত।

(৫) একটি ভালো আরবী অভিধান থাকা উচিত, কুরআনের অভিধান হলে আরও ভালো, যাতে করে আপনি শব্দার্থের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন।

(৬) শব্দাবলী বা বিষয়সমূহের বর্ণনা ক্রমিক সূচী যোগাড় করা উচিত।

অধ্যয়নের জন্য এ ধরনের কিছু সহায়িকার তালিকা এই বইয়ের পিছনে দেয়া হয়েছে।

কিভাবে অধ্যয়ন করতে হবে

নিম্নে নির্ধারিত অনুচ্ছেদ বিস্তারিতভাবে অধ্যয়নের জন্য একটি পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য এজন্য কোন নির্দিষ্ট বিধি নহে। মূলতঃ আপনি আপনার সামর্থ ও সীমাবদ্ধতার উপযোগী করে একটি নিজস্ব প্রক্রিয়া গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি কাজে লাগাতে পারেন। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে আপনাকে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পন্থায় অগ্রসর হতে হবে এবং চেষ্টা করুন নিম্নোক্ত ক্রমধারা অনুসরণ করতে।

আপনি নিজের মতো করে গোটা অনুচ্ছেদটি পাঠ করুন। অতঃপর আপনার অধ্যয়নের সহায়তাকারীর সাথে পরামর্শ করুন, অথবা একজন যোগ্য শিক্ষকের নিকট থেকে এর অর্থ যতটা সম্ভব শিখে নিন। পরিশেষে উভয় দিক থেকে আপনার শিক্ষাকে সংযুক্ত করে একটি পূর্ণ বুঝ আপনি নিতে চেষ্টা করুন যতটা সম্ভব।

প্রথম স্তর ঃ নিজেকে অবগত করুন এবং সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন।

ধাপ-১ ঃ দ্রুত উপলব্ধি করুন মৌলিক শর্তাবলী এবং আন্তরিক অংশগ্রহণ থেকে কি আপনি স্মরণ করতে পারেন। এটা অনুধাবন করুন যে, আল্লাহ

আপনার সাথে আছেন এবং যা আপনি পাঠ করতে যাচ্ছেন, তা বুঝতে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন।

ধাপ-২ ঃ কমপক্ষে তিনবার অনুচ্ছেদটি পাঠ এবং এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করুন। অথবা না দেখে এর মূল বিষয়বস্তু যতক্ষণ স্মরণ করতে না পারেন ততক্ষণ যতবার প্রয়োজন ততবার পাঠ করুন। তখন আপনি এটি আত্মস্থ করতে পারবেন এবং এর সম্পর্কে চিন্তা করতে সমর্থ হবেন যখনই আপনি চান।

নিয়মটি হলো ঃ ব্যাখ্যা দেখা শুরুর পূর্বে শব্দ ও অর্থসমূহ প্রবাহিত হতে দিন।

ধাপ-৩ ঃ মূল পাঠ ছাড়াই যেসব প্রধান বিষয়বস্তু আপনি আয়ত্তে আনতে পারেন, তা নোট করুন। পরে তা মূল পাঠের সথে মিলান এবং পুনরাবৃত্তি করুন।

ধাপ-৪ ঃ একটিও যদি বের করতে পারেন তো কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু নোট করুন।

ধাপ-৫ ঃ আপনার মতে একটি বক্তব্য বা বক্তব্যসমূহ রয়েছে এমন সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে তা বিভক্ত করুন।

ধাপ-৬ ঃ ঐসব শব্দ এবং বাগধারা আন্ডারলাইন করুন, যা আপনার মতে অর্থ বুঝার জন্য মূল বিষয়বস্তু।

ধাপ-৭ ঃ উপরে আমরা যেভাবে উল্লেখ করেছি, সেভাবে প্রশ্ন করুন।

দ্বিতীয় স্তর ঃ যা আপনি পড়েছেন, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন। নিজে নিজেই প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে চেষ্টা করুন, অর্থ এবং বক্তব্য কি, তা বুঝতে চেষ্টা করুন।

ধাপ-৮ ঃ গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহের কি অর্থ তা বের করুন।

ধাপ-৯ ঃ প্রতিটি বাগধারা বা বিবৃতির অর্থ নির্দিষ্ট করুন।

ধাপ-১০ ঃ ভেবে দেখুন কিভাবে তারা পরস্পর সম্পর্কিত, কিভাবে একটি

অপরটির অনুবর্তী বা অগ্রবর্তী হয়, কি ঐক্য বা সুসংগতি রয়েছে তাদের মধ্যে।

ধাপ-১১ ঃ অর্থ বের করা ও বুঝার চেষ্টা করুন অনুচ্ছেদের সরাসরি মূল বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে, সূরার বৃহত্তর বিষয়বস্তু এবং কুরআনের সামগ্রিক মূল বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে।

ধাপ-১২ ঃ নির্দিষ্ট করুন এর বিভিন্ন বক্তব্য এবং শিক্ষা কি কি।

ধাপ-১৩ ঃ জিজ্ঞেস করুন, আমার এবং আমাদের কালের প্রতি এর বক্তব্য কি?

ধাপ-১৪ ঃ চিন্তা করুন আপনি, উম্মাহ, এবং মানবতা এর প্রতি কিভাবে সাড়া দিতে পারে।

তৃতীয় স্তর ঃ আপনার যে অধ্যয়ন সহায়িকা বা শিক্ষকই থাকুক না কেন, তাদের সাহায্যে দ্বিতীয় স্তরের ধাপ ৮-১৪-এর মাধ্যমে অর্থ বুঝার চেষ্টায় নিয়োজিত হন। আপনার নিজের বুঝকে পুনরধ্যয়ন, সংশোধন, সংযোজন, আধুনিকীকরণ করুন, সঠিক বলে অনুমোদন করুন অথবা প্রত্যাখ্যান করুন।

চতুর্থ স্তর ঃ এইভাবে যে বুঝ পেলেন তা লিখে রাখুন অথবা হৃদয় ও মনে সংরক্ষণ করুন।

যেসব প্রশ্ন থেকে যায় তা লিপিবদ্ধ করুন। কোন বুঝকে পরিপূর্ণ এবং চূড়ান্ত হিসেবে নেবেন না। আপনি যতই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখবেন আরও অর্থ পেতে থাকবেন এবং পুনরধ্যায়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকবেন।

কিভাবে অর্থ বুঝতে হবে

কুরআন বুঝার জন্য যে মূলনীতি ও নির্দেশিকা অনুসরণ করা প্রয়োজন, তা পুরোপুরি বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে বিরাট এক গ্রন্থ রচনা করতে হবে।

কুরআন বুঝার জন্য প্রচেষ্টাকালে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত এমন অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা এখানে আমরা দিতে পারি। ■

একটি জীবন্ত বাস্তবতা হিসেবে উপলব্ধি

এক ঃ কুরআনের প্রত্যেকটি শব্দ এমনভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন যেমন মনে হবে এটা যেন আজই নাযিল হয়েছে। ১৪০০ বছর আগে যখন এটা প্রথম প্রেরণ করা হয়, তখন এই গ্রন্থটি যেমন প্রাসংগিক ও জীবন্ত ছিল আজকের আধুনিক কালেও এটিকে তেমনিভাবে গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু এটা চিরন্তন এবং এর আবেদন কোন ভিন্ন বক্তব্য পরিবেশন করে না। কোন অবস্থাতেই কুরআনের কোন বক্তব্যকে কোন অতীতের কথা হিসেবে গ্রহণ করবেন না। তখনই কেবল আপনি কুরআনের বাণীকে চিরন্তন হিসেবে বুঝতে পারবেন চিরঞ্জীব আল্লাহর কথা হিসেবে যিনি সর্বদা প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে জাগ্রত আছেন।

এটি কুরআন অধ্যয়নে মনোনিবেশে আপনার আত্মার জন্য জরুরী, আপনার হৃদয় ও বুদ্ধিমত্তার সর্বদা এই নির্দেশিকার মাধ্যমেই আবেদন জানানো উচিত। এর তাৎপর্য অনেক। এটি কুরআনে যা আছে তার অর্থ করতে আপনাকে সহায়তা করবে যাতে এর আলোকে আপনি আপনার জগতকে বুঝতে পারেন।

এর আলোকে আপনি তখন এটি আপনার নিজের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োগ করুন। সমসাময়িক চিন্তার বিষয়, বিভিন্ন ইস্যু, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের স্তর ও আপনার সময়ের প্রযুক্তি সবকিছুই কুরআনে তার জবাব খুঁজে পাবেন।

আপনার জন্য একটি বাণী হিসেবে বুঝুন

দুই ঃ আরও গুরুত্ব সহকারে কুরআনের প্রতিটি বাণীকে এভাবে নিন যেন তা আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য। একবার যদি কিছু অগ্রগতি সাধন করতে পারেন, তাহলে কুরআনের প্রতিটি আয়াত আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে কি শিক্ষা দেয় তা বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। আপনি এটি আগেও দেখেছেন যে, আপনার হৃদয়ের গভীর থেকে উপলব্ধির জন্য এটা কিভাবে করা উচিত। এখন আপনার

অনুভব করা উচিত কুরআন বুঝতে এটি আপনার হৃদয়কে কিভাবে উন্মুক্ত করে দেয়। একদা এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কুরআন শিখতে আসলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা যিলযাল শিক্ষা দিলেন। যখন তিনি এই আয়াতের নিকট পৌঁছলেন, "উপরন্তু যে লোক বিন্দু পরিমাণ নেক আমল করে থাকবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে লোক বিন্দু পরিমাণ বদ আমল করে থাকবে, সেও তা দেখতে পাবে।" তিনি বললেন, এটিই আমার জন্য যথেষ্ট। এই বলে তিনি চলে গেলেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মন্তব্য করলেন এই লোকটি একজন ফকীহ হয়ে ফিরলো" (সুনান আবু দাউদ)।

প্রকৃতপক্ষে আমি বিশ্বাস করি পবিত্র কুরআনে এমন একটি অনুচ্ছেদও নেই, যা আপনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কোন বার্তা বহন করে আনে না অথবা আপনার জন্য শিক্ষণীয় নয়। কিন্তু এটি উপলব্ধি করার অন্তর্দৃষ্টি আপনার থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি কথাই তাঁর সাথে আপনার একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। পরকালের প্রতিটি বর্ণনা আপনাকে এর জন্য প্রস্তুতি নিতে বলে অথবা এর পুরস্কারের জন্য অনুপ্রাণিত করে অথবা এর খারাবি থেকে ক্ষমা চাইতে বলে। প্রতিটি সংলাপ আপনাকে এর সাথে জড়িত করে। প্রতিটি চরিত্র একটি নমুনা পেশ করে। আপনাকে হয় অনুসরণ করতে হবে, না হয় অস্বীকার বা প্রত্যাখান করতে হবে। প্রতিটি আইনগত বিধি তা যদি দৃশ্যতঃ বর্তমান অবস্থায় আপনার উপর প্রযোজ্য নয় বলেও প্রতীয়মান হয়, তথাপি তার একটি পয়গাম বা বার্তা রয়েছে আপনার জন্য। অতি সাধারণ বিবৃতি যা সর্বদাই আপনার জন্য বিশেষ অর্থবহ হতে পারে, আবার খুবই বিশেষ একটি বিবৃতি যা ঘটনা ও পরিস্থিতির কারণে আপনার জীবনে সর্বদাই সাধারণ অর্থ প্রকাশক হতে পারে।

সমগ্র কুরআনের অংশ হিসেবে বুঝুন

তিন ঃ সমগ্র কুরআন নিজের মধ্যেই একটি একক। এটি একটি একক প্রত্যাদেশ। যদিও বিভিন্ন পন্থায়, বিভিন্নভাবে এই বাণী প্রেরণ করা হয়েছে, তথাপি খোদ এই বাণীটি হচ্ছে একটি বাণী। এর রয়েছে একটি বিশ্বদৃষ্টি এবং

একটি সামগ্রিক পথ-নির্দেশনার কাঠামো। সবগুলো যন্ত্রাংশই পুরোপুরিভাবে একটি অন্যটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি যে আল্লাহ্ প্রদত্ত অবতীর্ণ ব্যবস্থা এটি তারই একটি চিহ্ন।

এরা কি কুরআন গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে আসতো, তবে এতে অনেক কিছুই বর্ণনা-বৈষম্য পাওয়া যেতো" (আন নিসা ঃ ৮২)।

এই একটি মাত্র বাণী এবং অবকাঠামো পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করতে চেষ্টা করা উচিত। তখন প্রতিটি জিনিস আপনি একক গ্রন্থ কুরআনের বাণীর অংশ হিসেবে বুঝতে পারবেন তা একটি মাত্র শব্দ, আয়াত, অনুচ্ছেদ অথবা সূরাই হোক। কখনও কোন কিছুকে কুরআনী কাঠামো থেকে আলাদা করবেন না। অন্যথায় আপনি একটি বিকৃত অর্থের সন্ধান পেতে পারেন। যে অর্থই আপনি পান না কেন, তা সামগ্রিক প্রতিপাদ্যের সাথে যাচাই করে নিন। যখন কোন নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ পাঠ করেন, তখন আপনাকে তা ব্যাখ্যা করতে হবে, গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং প্রতিটি বাক্য এবং পৃথকভাবে প্রতিটি শব্দ বুঝার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সবগুলোকে সম্মিলিতভাবে একটি রূপ দিতে ভুললে চলবে না এবং ঐ সমন্বিত চিত্রটি কুরআনের সামগ্রিক বক্তব্যের নিরিখে বিচার করতে হবে। অন্যথায় আপনার নির্ধারিত পাঠ আপনাকে বিপরীত দিকে নিয়ে যাবে। এটি ব্যতীত নির্ধারিত পাঠ কুরআন দ্বারা পরিচালিত হবার বদলে আপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে নির্দিষ্ট আয়াত ব্যবহারের ভ্রান্তিতে আপনাকে নিমজ্জিত করতে পারে।

আপনার যুগের সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআনের প্রয়োগ করতে হলে আপনাকে সমগ্র কুরআনকেই আপনার অধ্যয়নের আওতায় নিতে হবে। অন্যথায় আপনি কুরআনের দৃষ্টিতে সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়নের পরিবর্তে কুরআনকে কেবল সমসাময়িক চিন্তাধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করার মারাত্মক ভুলটাই করবে সবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি সূচীর মাধ্যমে কুরআন অধ্যয়নের ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার কথা বলা যায় না। অবশ্য, কুরআন বারবার অধ্যয়ন এবং তা পুরোপুরি বুঝা ব্যতীত আয়াতের সূচী সংগ্রহ করে কোন বিষয়ের অধ্যয়ন

করবেন না। আপনার নিজস্ব অধ্যয়নের ভিত্তিতে যখন আপনি একটি রেফারেন্স দেখার প্রয়োজন অনুভব করবেন কেবল তখনই তা ব্যবহার করুন।

সামঞ্জস্যপূর্ণ একক বিষয় হিসেবে বুঝুন

চার ঃ বাহ্যিকভাবে এলোপাথাড়ি মনে হলেও মূলতঃ কুরআনের সর্বোন্নত মানের সামঞ্জস্য ও শৃংখলা রয়েছে। একটি অংশের সাথে অন্যটি সম্পর্কিত, আয়াতের সাথে আয়াত এবং সূরার সাথে সূরা সম্পর্কিত। বিষয়বস্তুর বাহ্যিক ওঠা-নামার অন্তরালে একটি ঐক্যসূত্র বিদ্যমান। আর এ কারণেই অনুলিপি লেখকদেরকে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন কোন্ প্রত্যাদেশটির স্থান কোথায় হবে। এই অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য আপনার খুঁজে বের করা উচিত, যদিও বা প্রথম পাঠেই আপনার পক্ষে তা করা সম্ভব নাও হতে পারে কিংবা এজন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। কেবল তখনই প্রতিটি অংশের পূর্ণ অর্থ আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন।

আপনার সামগ্রিক সত্তা দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করুন

পাঁচ ঃ অধ্যয়নে আপনার পুরো সত্তাকে বিলীন করে দিয়ে কুরআন বুঝতে চেষ্টা করুন। হৃদয় ও অন্তর, অনুভূতি এবং প্রজ্ঞা সবকিছুই আপনার ব্যক্তিসত্তার মধ্যে নিমজ্জিত। কুরআন কোন মোড়ক নয় যা বুদ্ধি দিয়ে মোড়ানো যায়। কেবল স্বর্গীয় উপদেশবাণীও নয়, যা পরমানন্দে উপভোগ করা যায়। কুরআনকে বিভিন্নভাবে বুঝতে চাওয়া ঠিক নয়, কুরআন অধ্যয়নের সময় বুদ্ধিমত্তা বা অনুভূতি এর কোনটাই পিছনে ফেলে আসা উচিত নয়, উভয়কেই এক সাথে সমন্বিত করতে হবে।

কুরআন কি বলছে তা বুঝতে চেষ্টা করুন

ছয় ঃ আপনি যা বলেন তা নয় বরং কুরআন কি বলে তা বুঝুন। কখনও আপনার মতামতের সমর্থন পাওয়ার জন্য, আপনার দৃষ্টিভঙ্গির নিশ্চয়তার জন্য, আপনার আবেদন প্রমাণের জন্য কুরআনের দ্বারস্থ হবেন না। আপনাকে অবশ্যই খোলা মন নিয়ে কুরআনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। আল্লাহর বাণী শুনতে এবং তার প্রতি আত্মসমর্পণ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঐকমত্যের ভিতর থাকুন

সাত ঃ কুরআন অধ্যয়ন এবং বুঝার ক্ষেত্রে আপনারাই প্রথম নন। আপনাদের পূর্বে রয়েছেন এক ধারাবাহিক মানবগোষ্ঠী। যারা এ কাজটি করেছেন এবং এর সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রচনা করে গিয়েছেন, আপনি তাদের অবহেলা করতে পারেন না। সুতরাং কুরআনের পথে আপনার এমনভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত নয় যেন আপনার আগে আর কেউ তেমনটি করেননি। এমন কোন অর্থই বৈধ, সঠিক বা গ্রহণযোগ্য নয়, যা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বক্তব্যের বিপরীত অথবা যার উপর মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য রয়েছে তার বিপরীত। এক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে আমাদের যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে, তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং নতুন উপসংহারের ভিত্তি খুবই গভীর পাণ্ডিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

কেবল কুরআনিক মানদণ্ডে বুঝুন

আট ঃ কুরআন অন্য কোন গ্রন্থের মত নয়। প্রতিটি দিক থেকেই এই গ্রন্থ অনন্য, কুরআনের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব অভিধা, নিজস্ব স্টাইল, নিজস্ব অলংকার, দর্শন এবং যুক্তি। উপরন্তু একটি অসাধারণ আবেদন এবং উদ্দেশ্য। কুরআন বহির্ভূত মানবিক মানদণ্ড দিয়ে কুরআন বুঝার চেষ্টা অর্থহীন।

এর একক উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবতাকে প্রতিটি মানুষকে তার স্রষ্টার দিকে পরিচালিত করা, মানব জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন এবং আল্লাহর সাথে সম্পূর্ণ এক নতুন সম্পর্ক স্থাপন করা। সবকিছুই এই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার জন্য এবং এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সবকিছু নির্ধারিত। এর কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে।

প্রথমত ঃ যদিও বা এর অর্থের মাহাসমুদ্রের গভীরতার কোন শেষ নেই, তথাপি জীবন পরিচালনায় একজন সাধারণ সত্যানুসন্ধানীর জন্য অর্থগুলো সহজ ও বোধগম্য। সত্যিকারের মনোভাব নিয়ে এবং সত্যপথে অগ্রসর হতে চাইলে যেসব অর্থ হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট তা সহজেই বুঝা যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ কুরআনের ভাষা এমন যে সাধারণ লোক তা বুঝতে সক্ষম। দৈনন্দিন

জীবনে সাধারণ মানুষ কথোপকথনে যেসব শব্দ ব্যবহার করে কুরআনে এসব শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন নতুন অবোধগম্য পরিভাষা ব্যবহার করে না, কিংবা দর্শন, বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যার টেকনিক্যাল ও একাডেমিক ভাষা ব্যবহার করে না। তবে পুরানো ও প্রতিদিনের ব্যবহৃত শব্দের মধ্যেই সম্পূর্ণ নতুন অর্থ প্রকাশ করে থাকে।

তৃতীয়ত ঃ কুরআন কোন ইতিহাসেরও গ্রন্থ নয় অথবা বিজ্ঞানেরও বই নয়। কিংবা দর্শন বা যুক্তিবিদ্যারও গ্রন্থ নয়। যদিও বা কুরআন এর সবগুলোই ব্যবহার করে থাকে। তবে তা কেবল মানুষের হিদায়াতের জন্যই। সুতরাং কুরআনের মাধ্যমে সমসাময়িক মানবিক জ্ঞানের অনুমোদনের চেষ্টা করবেন না। কিংবা এটা বুঝার জন্য সেই জ্ঞান অপরিহার্য নয়। যদিও বা উপলব্ধি ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

কুরআনের সাহায্যে কুরআন বুঝুন

নয় ঃ কুরআনের সর্বোৎকৃষ্ট তাফসীর হচ্ছে কুরআন নিজেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অনেক শব্দ ও বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যহীন পুনরাবৃত্তি নয়। একটি নির্দিষ্ট শব্দ বা বক্তব্যের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এর অর্থের নতুন একটি দিক তুলে ধরা হয় এবং এর অর্থে নতুন আলোর সন্ধান দেয়। সেই অর্থটি আপনার বুঝতে চেষ্টা করা উচিত।

অতএব, কোন একটি শব্দ, আয়াত, অনুচ্ছেদ বুঝার জন্য কুরআনের উপরই দৃষ্টিপাত করুন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রব, ইলাহ, দীন, ইবাদত, কুফর, ঈমান, যিকর এসব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বিভিন্ন স্থানে কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে তা অধ্যয়ন করে ভালো বুঝতে পারেন।

হাদীস ও সীরাতের মাধ্যমে বুঝুন

দশ ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রধান দায়িত্বের একটি ছিল কুরআনকে বুঝানো ও ব্যাখ্যা করা। এ দায়িত্বটি তিনি পালন করেছেন তাঁর কথা ও কাজে দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে। সুতরাং গোটা হাদীস শাস্ত্র এবং সীরাত কুরআন বুঝার জন্য এক মূল্যবান উৎস। যে হাদীসে তাফসীর রয়েছে কেবল

সেই হাদীসই নয় বরং সব হাদীসই এজন্য সহায়ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঈমান, জিহাদ ও তাওবা বিষয়ক হাদীস কুরআন বুঝার জন্য আপনার বিরাট সহায়ক হবে, যখন আপনি অনুরূপ বিষয়বস্তুর মুখোমুখি হবেন।

ভাষা

এগারো ঃ ভাষাই কুরআনের প্রথম চাবি। ভাষার মাধ্যমে কুরআন নিজেকে সুস্পষ্ট, জীবন্ত এবং বোধগম্য করে তুলে। আরবী ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য যা কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনাদেরকে সচেতন থাকতে হবে।

প্রথমত ঃ কুরআনের স্টাইল বক্তৃতার মতো লিখনের মত নয়। একটি বক্তব্যে কিছু আরবী ভাষার কিছু জিনিস অব্যক্ত থেকে যেতে পারে, যা প্রত্যক্ষ শ্রোতাদের বুঝার জন্য অসুবিধাজনক নয়। এটা এর কার্যকারিতা ও শক্তি বৃদ্ধি করে। কেননা, শ্রোতারা অব্যাহতভাবে বক্তা, তার শব্দ এবং তাদের পরিবেশের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ করে। অনেক বেশি বিস্তারিত কথা বক্তৃতাকে নিরস করে দেয়।

কুরআনে দেখা যায় অকস্মাৎ কালের পরিবর্তন। এগুলোও মূল পাঠের জীবন্ত তাৎপর্য বাড়িয়ে দেয়। এসবের পরিবর্তনে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট করতে হবে যে, কাকে কি বলছে, অনেক সময় অকস্মাৎ থেমে যাওয়ার ঘটনা আছে, আপনাকে এসব সনাক্ত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ কেবল এটাই নয় যে, আরবী ভাষা খুবই সংক্ষিপ্ত ও বিশেষ অর্থবোধক। প্রায়ই এটি সংশ্লিষ্ট শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যবহার করে না। সুতরাং এখানে রয়েছে অস্পষ্টতা, অনুল্লেখ, সংযোজন, বিয়োজন, গোপন করা, বিকল্প শব্দের ব্যবহার এবং অনুরূপ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ। এ ব্যাপারে আপনাকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। এসব আপনি শিখতে পারেন কেবল তাফসীর ও শিক্ষকের নিকট থেকে।

তৃতীয়ত ঃ শব্দ বা মূল পাঠের সরাসরি অর্থ কুরআন বুঝার জন্য যথেষ্ট নয়। সামগ্রিক বিষয়দৃষ্টি, কুরআনের বাচনভংগি, সাহিত্যিক কৌশল থেকে আপনাকে কিছু বুঝ ও অনুভূতি অর্জন করতে হবে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কালের মতো

আরবী ভাষার জ্ঞান থাকলে তা হবে খুবই সাহায্যকারী। যদিও বা শিক্ষার্থী হিসেবে শুরুতে এটা আপনার আয়ত্তের বাইরেই থাকবে।

পদ্ধতিগত দিক-নির্দেশনা

উপরের আলোচনার কাঠামো ও সাধারণ মূলনীতির ভিত্তিতে কিছু পদ্ধতিগত দিক-নির্দেশনা আপনার জন্য খুব প্রয়োজনীয় হতে পারে।

শব্দ অধ্যয়ন

এক ঃ প্রথমত আপনি ঐসব শব্দের অর্থ জানতে চেষ্টা করুন যেসব শব্দ দ্বারা মূল পাঠ বুঝতে পারা খুব কঠিন, আপনার প্রাথমিক গাইড হবে অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর গ্রন্থ। অভিধান চর্চা করুন কিন্তু অভিধানের অর্থকেই যথার্থ মনে করবেন না। আপনার সর্বোত্তম এবং চূড়ান্ত গাইড হচ্ছে শব্দের অব্যবহিত মূলপাঠ যেমন সমস্ত কুরআন এবং এর বিশ্বদৃষ্টি।

মূল পাঠের বিষয়বস্তু

দুই ঃ আপনি যদি শব্দসমূহ ও সরাসরি আক্ষরিক অর্থ বুঝেন, তাহলে অনুচ্ছেদটি মূল পাঠের বিষয়বস্তুর মধ্যে স্থাপন করুন এবং বুঝতে চেষ্টা করুন অর্থ কি? সামনের এবং পিছনের মূল পাঠ পড়ুন এবং প্রয়োজনে গোটা সূরাটি পাঠ করুন।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

তিন ঃ যতটা সম্ভব প্রয়োজনীয় প্রাসংগিক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করুন। কিন্তু এর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

এ প্রসংগে নাযিলের কারণ বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সাক্ষাৎ পাবেন আপনি। ঐসব হাদীস গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিবে। কিন্তু দুটি বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে।

প্রথমত ঃ এসব বর্ণনায় ওহী নাযিলের সময়কার ঐতিহাসিক ঘটনা সর্বদা হুবহু নাও বলা হতে পারে। পক্ষান্তরে সেই পরিস্থিতি যাতে এটি প্রাসংগিক ও বাস্তব বিবেচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রত্যাদেশ সম্পর্কে মূল পাঠের প্রমাণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যখন ঐতিহাসিক তথ্য গ্রহণ করা হচ্ছে, তখন এটি নির্দিষ্ট করা উচিত নয়।

তৃতীয়ত ঃ মূল বক্তব্য বুঝার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্য কুরআন বুঝার জন্য বাধার কারণ হওয়া উচিত নয়।

মূল অর্থ

চার ঃ সরাসরি আক্ষরিক অর্থ আত্মস্থ করার পর যথাসম্ভব চেষ্টা করুন যেভাবে কুরআনের প্রথম শ্রোতারা বুঝেছিলেন সেইভাবে বুঝতে। আক্ষরিক অর্থ বুঝা হয়তো বা সহজ হতে পারে। কিন্তু ১৪০০ বছর পর ভিন্ন সভ্যতা ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে মূল অর্থ বের করা কঠিন ও জটিল একটি কাজ। অসুবিধাগুলো আলোচনার স্থান এটা নয়। কেবল সতর্কতার জন্য উল্লেখ করা হলো।

বর্তমান প্রেক্ষিতে অনুবাদ

পাঁচ ঃ আপনার পরবর্তী কাজ হচ্ছে আপনার নিজস্ব অবস্থার প্রেক্ষিতে পড়া ও বুঝার চেষ্টা করা। এটাও মূল অর্থ নির্ধারণের মতই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিশেষ করে আপনি যদি আপনার ধারণা অনুযায়ী কুরআন পাঠের ফাঁদে পড়তে না যান। আবার এ সম্পর্কে ব্যাখ্যার জটিল সমস্যাগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করাও সম্ভব নয়। কিন্তু এটি এমন একটি কাজ যা আপনি অবজ্ঞা করতে বা এড়িয়ে যেতে পারেন। একটি প্রাথমিক মৌল বিষয়ে যদি আপনি মনোযোগী থাকেন এবং পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে খোলা মন নিয়ে কুরআনের কাছে আসুন এবং আপনি যা চিন্তা করেন, তাই সঠিক স্বীকৃতি এই রায় নেয়া থেকে বিরত থাকুন। কারণ এটি একটি ফাঁদ যা আপনার এড়িয়ে চলা উচিত। জটিল আইনগত ও নৈতিক বিষয়াদির পরিবর্তে আপনার জীবনের জন্য অপরিহার্য বাণীর উপরই আপনার মনোনিবেশ করা উচিত। এটা সম্ভব এবং কখনও প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিতে পারে আমাদের সমসাময়িক কালের পরিভাষা, ব্যাখ্যা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভংগি সামনে নিয়ে আসা। কিন্তু এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে যে, কোন অবস্থাতেই যেন আসল অর্থ ও পরিভাষা হারিয়ে না যায়।

অপ্রাসংগিক অর্থ

ছয় ঃ দূরবর্তী, কষ্টকল্পিত, রূপকাশ্রিত অন্তর্নিহিত অর্থ যা সাধারণ মানুষ বুঝে না, তা আবিষ্কারে নিজেকে নিয়োজিত করবেন না। এমন অর্থ সম্পর্কে ভাবার প্রয়োজন নেই, যা আপনার জীবনের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং কুরআনের প্রথম যুগের বিশ্বাসীদের জীবনধারার সাথেও সম্পর্কিত ছিল না।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্তর

সাত ঃ যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আপনি অধিকারী, সেই স্তরেই অর্থ বুঝতে চেষ্টা করুন। যাই হোক, প্রথম শ্রোতারা যে জ্ঞান স্তরের ছিলেন তা হারাবেন না যাতে করে আপনি গোল্লায় না যান। আপনার নিজের জ্ঞানের কথাই কুরআনে পড়তে শুরু না করেন।

বর্তমান মানবিক জ্ঞান

আট ঃ এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রতিটি ব্যক্তি কুরআন বুঝার জন্য তার নিজের জ্ঞানকে নিয়োজিত করবে। অবশ্য তার জ্ঞানটা কুরআনের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে দিক-নির্দেশনা পেতে হলে আধুনিক মানদণ্ড প্রয়োজন। আপনার সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধিকে কুরআন বুঝার জন্য আপনার সাহায্যে নিয়োজিত করুন কিন্তু কখনও কুরআনকে আপনার সমসাময়িক জ্ঞানের সমর্থনে হাযির করবেন না। আজকের যুগের বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কার সম্পর্কে কুরআনকে দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করাবেন না। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে সতর্ক থাকুন যেসব তত্ত্ব পরিবর্তনশীল বালি-কণার মতো। কুরআনে আইনস্টাইন কোপার্নিকাস, নিটশে অথবা বার্গসন-এর তত্ত্ব অনুসন্ধান করা তেমনি ভুল হবে, যেমন ভুল ছিল টলেমি, এরিস্টটল এবং প্লেটো সম্পর্কে অনুসন্ধান।

যা আপনি বুঝতে পারেন না

নয় ঃ কুরআনে এমন অনেক শব্দ ও বাক্য রয়েছে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সেসবের অর্থ আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন না। এটা এ কারণে হবে যে, আপনার পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই অথবা এজন্য যে, এটা খুব কঠিন। এমন পরিস্থিতিতে অসুবিধাটা

সম্পর্কে একটি নোট রেখে পরবর্তী অধ্যয়নে মনোনিবেশ করুন। এমন কোন বিষয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য সময় নষ্ট করবেন না, যা এক পর্যায়ে আপনার যোগ্যতাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

রাসূল (সা)-এর জীবন

কুরআন বুঝা এবং আত্মস্থ করার জন্য যতটা পারেন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটবর্তী হন, যিনি প্রথম আল্লাহর নিকট থেকে কুরআন গ্রহণ করেছেন। তাঁর জীবন হচ্ছে কুরআনের অর্থ ও বাণীর সঠিক প্রতিচ্ছবি এবং নিশ্চিত হিদায়াতের প্রতীক এবং সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন হচ্ছে জীবন্ত কুরআন। আপনি যদি কুরআনকে দেখতে চান, তাহলে কেবল পড়ার পরিবর্তে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনকে দেখুন। কেননা হযরত আয়িশা (রা) বলেছেন, তাঁর জীবনটা ছিল কুরআন ব্যতীত কিছুই নয়। বিখ্যাত তাফসীর ইবনে কাছির, ইবনে জারীর, কাশশাফ এবং রাযীর চাইতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন চরিত কুরআন বুঝার জন্য আপনার কাছে অনেক বেশি সহায়ক হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নৈকট্য লাভের জন্য প্রথমত ঃ আপনাকে তাঁর বক্তব্য হাদীস, তাঁর জীবন চরিত পাঠ করা উচিত যতটা বেশি আপনার পক্ষে সম্ভব হয়। যদিও তাঁর জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যাবে না তথাপি কুরআনের মধ্যে আপনি তাঁর জীবন চরিতের সর্বোত্তম বর্ণনা পাবেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর সুন্নাহকে অনুসরণ করার জন্য চেষ্টা করুন। এর মাধ্যমে আপনি সত্যি সত্যিই তাঁকে বুঝতে পারবেন, অতএব কুরআনকে বুঝতে পারবেন এবং আল্লাহকে আপনি ভালবাসবেন আর আল্লাহও আপনাকে ভালোবাসেন (আলে ইমরান ঃ ৩১)। ■

৭ ঃ সামষ্টিক পাঠ

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

কুরআনের জ্ঞান ভাণ্ডারে পরিক্রমণের জন্য আপনাকে একটি অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিতে হবে বা সম্পৃক্ত হতে হবে। নিঃসন্দেহে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কুরআন অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু আপনি যদি অন্যান্য বিশ্বাসী এবং কুরআন সন্ধানীদের সাথে সহপাঠী হিসেবে যোগ দেন, তাহলে অনেক বেশিগুণে আপনি লাভবান হবেন। সাহচর্য আপনার হৃদয়কে অনেক বেশি উৎফুল্ল করবে এবং অনেক মন একসাথে মিলিত হয়ে অর্থকে আরও ভালো এবং অধিকতর শুদ্ধভাবে বুঝতে পারবে। কুরআন যে দীনের দায়িত্ব ও মিশন আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছে এবং আমাদের জীবন যেমন হওয়া উচিত তা কেবল অন্যদের সাথে মিলিতভাবেই অর্জন করা সম্ভব। সেই মিশন পূরণ করে এবং কাজের মাধ্যমেই কেবল আপনি কুরআনের সম্ভাব্য পূর্ণ আশীর্বাদ পাওয়ার যোগ্যতা লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে কুরআনের অভিভাষণ প্রায় সর্বদাই সামষ্টিক। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে মুহূর্ত থেকে কুরআনের প্রত্যাদেশ লাভ করা শুরু করেন, তখন থেকেই কুরআন কেন্দ্রিক একটি সমাজ বা সম্প্রদায় গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত (সময়) তিনি এ কাজে লাগিয়েছেন। 'পড়ো' এই আহ্বান এর পরপরই এসেছিল 'উঠো', 'জাগো', 'সতর্ক হও' এই নির্দেশ। তোমার প্রভুর কিতাবে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা পড়া অব্যাহত রাখার অব্যবহিত পরই নির্দেশ আসে-

'হে নবী তোমার আল্লাহর কিতাব হতে যা কিছু তোমার প্রতি ওহী হিসেবে নাযিল করা হয়েছে, তা শুনিয়ে দাও। তাঁর বলা কথার রদবদল করার অধিকার কারো নেই। তাঁর থেকে বেঁচে পালাবার কোন আশ্রয়ই তুমি পাবে না। আর তোমার দিলকে সেই লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখো, যারা নিজেদের খোদার সন্তুষ্টি লাভের সন্ধানী হয়ে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে" (আল কাহাফ ঃ ২৭-২৮)।

কুরআনের এইসব শিক্ষা অত্যন্ত পরিষ্কার ও দৃঢ়ভাবে কুরআন পঠন ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী সমাজের প্রয়োজনীয়তার সাথে যোগসূত্র রচনা করে।

আবার কোন নামাযই কুরআন পাঠ ব্যাতীত সম্পূর্ণ হতে পারে না। অথবা জামায়াত ছাড়া নামায পূর্ণ হতে পারে না যদি না কোন উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান থাকে। যদি কুরআন শ্রবণ করা, তা হৃদয়ংগম করা এবং তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন না থাকবে, তবে নামাযে কুরআন পাঠের উদ্দেশ্যই বা কি? এইভাবে দিনে পাঁচবার সামষ্টিক প্রয়াসের মাধ্যমে নামাযে কুরআন পাঠের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে। কুরআনের পয়গাম বা বাণী সমগ্র মানব জাতির কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও কুরআন পাঠ এবং যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তিলাওয়াত শব্দটি যখন আরবী 'আলো' অব্যয়ের সাথে ব্যবহৃত হয়, তখন অর্থ হয় 'যোগাযোগ করা' 'প্রচার করা', 'বিশ্বাস ঘটানো', 'শিক্ষা দেয়া'। এইভাবে তিলাওয়াত করা নবূওয়াতের অন্যতম মৌলিক কাজ, অতএব নবীর উম্মতদের জন্যও।

"হে আল্লাহ! এদের প্রতি এদের জাতির মধ্য থেকেই এমন একজন রাসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ্ পাঠ করে শুনাবেন। তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুষ্ঠরূপে গড়বেন। তুমি নিশ্চয়ই বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ" (আল বাকারা ঃ ১২৯)।

"যেমন আমি তোমাদের প্রতি স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছে, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের অজ্ঞাত, তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়" (আল বাকারা ঃ ১৫১)।

সূরা জুমআয় আল্লাহর হিদায়াত বুঝা ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার ব্যর্থতাকে জুমআর নামাযে অংশ নেয়ার ব্যর্থতার আলোকে জোর দেয়া হয়েছে, যাতে জুমআর নামাযের সময় পার্থিব যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পরিবার ও বাড়ীর লোকদের নিকট কুরআন পাঠ করার ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

স্মরণ রেখো আল্লাহর আয়াত ও হিকমাতপূর্ণ সেইসব কথা যা তোমাদের ঘরে শুনানো হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও অভিজ্ঞ" (আল আহযাব ঃ ৩৪)।

যারা কুরআন পাঠ ও অধ্যয়নের জন্য সমবেত হন, তারা আশীর্বাদপুষ্ট। কারণ তাদের উপর মহান আল্লাহর অশেষ করুণা নিয়ে ফেরেশতা নাযিল হয়। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ

যখন মানুষ আল্লাহর কোন ঘরে কুরআন অধ্যয়ন এবং একে অপরকে শিখানোর জন্য সমবেত হয়, তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, আল্লাহর ক্ষমা ও রাহমাতের ছায়াতলে তারা স্থান পায়, ফেরেশতাগণ পাখা দিয়ে তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখেন এবং আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তাঁর চারপাশের সবাইকে অবহিত করেন (সহীহ মুসলিম)।

সুতরাং কেবল একা কুরআন পড়ে ও অধ্যয়ন করে আপনার সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। বরং কুরআনের ব্যাপারে অনুসন্ধানী এবং আগ্রহী যারা আছেন, তাদের খুঁজে বের করে দাওয়াত দিন যাতে সবাই এক সাথে কুরআন অধ্যয়ন করতে পারেন।

সামষ্টিক পাঠ দুই ধরনের হতে পারে

এক ঃ যেখানে ছোট একটি গ্রুপ অধ্যয়নের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে হাযির হন, কুরআন প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে কেউ বেশি জানা-শোনার অধিকারী হন এবং অধ্যয়ন পরিচালনা করে থাকেন। এ ধরনের অধ্যয়নকে আমরা স্টাডি সার্কল বলতে পারি।

দুই ঃ যেখানে একটি বড় বা ছোট গ্রুপ সমবেত হন এবং একজন বিজ্ঞ মুফাস্‌সিরের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা শুধু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। এ ধরনের পাঠকে আমরা দারস, বক্তৃতা বা আলোচনা বলতে পারি।

আপনার জানা উচিত একটি স্টাডি সার্কল কিভাবে পরিচালনা করতে

হয় এবং কিভাবে দারস পেশ করতে হয়। এখানে আমরা একটি সাধারণ পথ-নির্দেশ দিতে পারি। আবার এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এর কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড বা স্থায়ী প্রক্রিয়া হতে পারে না। প্রত্যেককেই নিজস্ব পদ্ধতির উন্নতি সাধন করতে হবে এবং তাদের প্রত্যেকের অবস্থা, সময় ও পরিবেশের উপর এটা নির্ভরশীল হবে। নিম্নে এ সম্পর্কে যে নির্দেশাবলী দেয়া হলো, তা পরামর্শ মাত্র। এসব পরামর্শ আপনার প্রয়োজন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

চারটি মৌলনীতি

যেকোন সামষ্টিক পাঠের সাফল্যের জন্য চারটি নীতি রয়েছে।

এক ঃ আপনার দায়িত্ব পালনের জন্য আপনাকে অবশ্যই সর্বদা যাবতীয় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ কাজটিকে হালকাভাবে নেয়া যাবে না। সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হবে। অতি দ্রুততার সাথে নজর বুলিয়ে যাওয়াকে যথেষ্ট মনে করা যাবে না। গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা না করে কখনও কুরআন সম্পর্কে কিছু বলবেন না। এটা সর্বদা উত্তম যে, আপনি যা অধ্যয়ন করেছেন এবং যা বলতে চান, তার জন্য একটি নোট তৈরি করবেন।

দুই ঃ আপনি একজন শিক্ষার্থীই হন, অথবা কিছু জ্ঞান আহরণ করে থাকুন, আপনি দারস পেশ করুন বা কোন চক্রের আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন সর্বাবস্থায় নির্দিষ্ট অংশের উপর আলোচিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী আপনার ব্যক্তি অধ্যয়নের একটি পরিকল্পনা থাকতে হবে।

তিন ঃ সর্বদা আপনার নিয়ত পরিচ্ছন্ন এবং সঠিক রাখুন। কুরআন বুঝা, তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ব্যাপারে আপনার নিয়তের স্বচ্ছতা অপরিহার্য।

চার ঃ নিছক আনন্দ লাভ, কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল নিবৃত্ত করা অথবা যুক্তি ও আলোচনার জন্য কুরআন অধ্যয়ন করবেন না। আপনার

কুরআন অধ্যয়ন অবশ্যই আপনাকে মেনে চলতে যেন উৎসাহী করে এবং কুরআন আপনাকে যে মিশন দিয়েছে, তা যেন আপনি পরিপূর্ণ করতে পারেন, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পাঠচক্র

গ্রুপ স্টাডি কার্যকর হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত নিয়মাবলী আপনার জন্য সহায়ক হতে পারে।

অংশগ্রহণকারী

এক ঃ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৩ থেকে ১০ হতে পারে। জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে সমমানের বা কাছাকাছি মানের হওয়া উচিত। কোন কিছু কম হলে এটি একটি সংলাপে পরিণত হতে পারে। পক্ষান্তরে বেশি হলে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণে অসুবিধা হতে পারে।

দুই ঃ সব সময় জোর দিতে হবে মূল বাণী, বিষয়বস্তু এবং কি পথ-নির্দেশ ও শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, তার উপর। কখনও এমন চমৎকার বিষয়বস্তুর দিক ঝুঁকে পড়া যাবে না, যার বাস্তব জীবনে কোন কার্যকারিতা নেই।

তিন ঃ সব সদস্যকে তাদের লক্ষ্য, সীমাবদ্ধতা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে পুরোপুরি সতর্ক থাকতে হবে।

চার ঃ সার্কেলের সদস্যদের অধ্যয়নের প্রতি এবং তা বাস্তবায়নের প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকতে হবে। এজন্য গভীর মনোযোগ ও কঠোর পরিশ্রম দরকার হবে। বিশেষ করে নিয়মিত প্রস্তুতি ও উপস্থিত থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ।

পাঁচ ঃ তাদেরকে জানতে হবে কিভাবে তারা কুরআনের পথে অগ্রসর হবেন এবং কুরআনের মাঝে পথ করে নিবেন। এই বইটি পাঠ করলে তাদের কিছুটা কাজে আসতে পারে।

ছয় ঃ তাদের আগন্তুকের মত বলা উচিত নয়। বরং কুরআন বুঝতে ও মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিশীল বিশ্বাসী ভাই হিসেবে বলতে হবে।

কিভাবে পরিচালনা করতে হবে

এক ঃ একজন সদস্য প্রথমে তার অধ্যয়নের একটি ফলাফল অর্থাৎ নির্দিষ্ট অংশ পড়ে তিনি কি বুঝেছেন, তা উপস্থাপন করবেন।

দুই ঃ অন্যরা তখন আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। তারা আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা, সংশোধন, সংযোজন, প্রশ্ন উত্থাপন কিংবা জবাব দান করবেন।

তিন ঃ যদি সকল সদস্যকেই অধ্যয়ন করতে হয়, তাহলে আপনি যদি পূর্বাহ্নেই নির্ধারিত করে দেন যে, কে প্রথম আলোচনা উপস্থাপন করবেন, তাহলে সুবিধা হবে। এতে উপস্থাপনার মান ভাল হবে। অথবা যে কাউকে আলোচনা বা উপস্থাপনার জন্য আহ্বান জানাতে পারেন। এ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হলে সবাই সতর্ক থাকবে এবং কঠোর পরিশ্রম করবে।

চার ঃ যদি কমপক্ষে একজন সদস্যও বেশি জ্ঞানের অধিকারী হন এবং মূল উৎস প্রয়োগের যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখেন, তাহলে সেটা খুবই ফলদায়ক হবে। মূল উপস্থাপকের আলোচনার কোন কমতি থাকলে তিনি তখন তা পূরণ করতে পারবেন। তিনি আলোচনার ধারা ও গতি নির্ধারণেও ভূমিকা পালন করতে পারেন।

পাঁচ ঃ কুরআনে অভিজ্ঞ এমন কেউ যদি থাকেন, তাহলে শুরুতেই আলোচনায় তার হস্তক্ষেপ করা উচিত হবে না। পক্ষান্তরে অংশগ্রহণকারীগণ আলোচনায় কি বলতে চান, তা বলতে দেয়া উচিত এবং তাদের বক্তব্য শেষে যদি দেখা যায় তাদের আলোচনায় ভুল আছে, তাহলে খুব ভদ্র ও নম্রভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে বা সংশোধন করতে হবে অথবা তাদের আলোচনার সাথে নিজের অভিজ্ঞতা যোগ করতে হবে। তার আলোচনার পদ্ধতি বিতর্কমূলক না হয়ে তা হবে পরামর্শ ও জিজ্ঞাসামূলক।

ছয় ঃ পাঠচক্র শেষে কোন একজন সদস্য, পরিচালক বা শিক্ষক হলেই

উত্তম আলোচনায় ব্যাপক বিষয়বস্তুর উপর সংক্ষিপ্ত উপসংহার টানবেন। সংশ্লিষ্ট আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ও দাবী কি, তা উল্লেখ করা উচিত।

দারস

নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করলে একটি দারস কার্যকরী হতে পারে।

প্রস্তুতি

এক ঃ শ্রোতাদের সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা নিতে হবে। শ্রোতাদের জ্ঞানের স্তর, বুদ্ধিমত্তা, ঈমানের অবস্থা, তাদের উদ্বেগ ও চিন্তা, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং চাহিদা সম্পর্কে জানতে হবে।

দুই ঃ আপনি যা বলতে আগ্রহী, তার চাইতে বরং শ্রোতাদের অবস্থা সামনে রেখে ও বিবেচনা করে দারসের জন্য নির্ধারিত অংশ ঠিক করুন।

তিন ঃ আপনার উপস্থাপনার ধরন, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি শ্রোতাদের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

চার ঃ কুরআনের সত্যিকার বাণী যাতে শ্রোতাদের সামনে আপনি পেশ করতে পারেন এ জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, প্রার্থনা করুন।

পাঁচ ঃ অনুচ্ছেদটুকু পাঠ করুন এবং আপনার নোট লিখুন। আপনি কি বলতে চান? কিভাবে ও কোন ক্রমানুসারে বলতে চান? কিভাবে শুরু ও শেষ করতে চান?

ছয় ঃ আপনার হাতে যে সময় আছে তার প্রতি যথাবিহিত সম্মান দেখাতে হবে। কোনক্রমেই সময় অতিক্রম করবেন না। আপনার হয়তো অনেক সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট বা কথা বলার থাকতে পারে এবং এসব বলার আগ্রহও আপনার মনে থাকতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার শ্রোতার সামর্থ্য খুবই কম, ধারণ-ক্ষমতাও সীমিত। তারা আপনার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করতে পারেন কিন্তু আপনার নিকট থেকে তেমন কিছু শিখতে তারা পারবেন না।

অনেক দীর্ঘ অনুচ্ছেদ সংক্ষেপে পেশ করা যায়, আবার অনেক ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদ দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী আলোচনা করা যেতে পারে। এর সবই নির্ভর করে একটি বিষয়ের উপর। আর তা হচ্ছে আপনার অধ্যয়নের প্রেক্ষিতে আপনি কি মেসেজ দিতে চান তা।

সাত ঃ এ বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে যে, আপনার মেসেজ অত্যন্ত পরিষ্কার হতে হবে। আপনি শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ এবং অনুসরণের জন্য যা উপস্থাপন করতে চান আলোচনায় তা পরিষ্কার হওয়া জরুরী। অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্যের সাথে এটি সংগতিপূর্ণ হতে হবে, আপনার ইচ্ছামত নয়।

কিভাবে পরিবেশন করবেন

এক ঃ আপনার মাত্র দুটি লক্ষ্য হবে ঃ

প্রথমত ঃ অন্যকে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে আপনার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর রেযামন্দি বা সন্তুষ্টি হাসিল করা। দ্বিতীয়ত ঃ পরিচ্ছন্ন এবং কার্যকরভাবে আল্লাহর কুরআনের বাণীকে পরিবেশন করা।

দুই ঃ মনে রাখবেন যে, শ্রোতাদের নিকট আপনার বক্তব্য কার্যকরভাবে পৌঁছা, তাদের হৃদয় ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, সম্ভাব্য উত্তর প্রস্তুতি কার্যকরভাবে পরিবেশন, কুরআনের বাণীকে তাদের কাছে জীবন্ত গতিশীল করে তোলা, তাদের উৎকণ্ঠার সাথে সাদৃশ্য স্থাপন ইত্যাদির দায়িত্ব থেকে আপনি মুক্ত।

আপনার উপস্থাপনা উচ্চাঙ্গের ভাল বক্তাসুলভ কিংবা বাগ্মিতাপূর্ণ নাও হতে পারে। হতে পারে তা খুবই সাদামাটা। কিন্তু আপনার নিয়ত এবং উদ্যমই হচ্ছে আসল জিনিস।

তিন ঃ প্রথমে আপনি কুরআন তিলাওয়াত করবেন এবং তার অনুবাদ পেশ

করবেন। এরপর প্রতিটি আয়াত পড়ে বা না পড়ে এবং অনুবাদ পুনরায় করে বা না করে ব্যাখ্যায় যেতে পারেন। অথবা সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দিয়ে একটার পর একটা আয়াত অথবা কয়েকটি আয়াত একসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে পারেন। কোন্ পদ্ধতি আপনি অবলম্বন করবেন, তা অবস্থা এবং সময়ের উপর নির্ভর করবে।

স্মরণ রাখবেন যে, শুরুতেই গোটা অংশ তিলাওয়াত করে নিতে হবে এটা সর্বদা জরুরী নয়। বিশেষ করে যদি সময় কম থাকে। বরং শ্রোতৃমন্ডলীকে আপনার বক্তব্য শোনার জন্য পরিবেশ সৃষ্টিতে আপনি সেই সময় খরচ করতে পারেন।

চার ঃ যতটা সম্ভব প্রতিটি আয়াত অথবা কতিপয় আয়াতের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির একটি সংমিশ্রণ আপনি ব্যবহার করতে পারেন। যদি আয়াত সংক্ষেপ এবং স্পষ্ট হয়, তবে আপনি তা প্রথমে পাঠ করে পরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারেন। ব্যাখ্যার আগে ও পরে আপনি মূল বক্তব্য দিয়ে যেতে পারেন।

যা আপনাকে নিশ্চিত করতে হতে তা হচ্ছে এই প্রতিটি শ্রোতাই যেন এক সুসংগতিপূর্ণ একাত্মতা অনুভব করে। প্রতিটি বক্তব্য এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে আগের কথা ও পরের কথার মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

পাঁচ ঃ আলোচনা শেষে আপনাকে অবশ্যই একটি মূল বিষয়বস্তুর সারমর্ম দিতে হবে এবং এতে কি শিক্ষণীয় পয়গাম রয়েছে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যদি সময় থাকে, তাহলে সমগ্র টেক্সট বা শুধু অনুবাদও আপনি আবার পড়তে পারেন। সমাপ্তিকালে মূল পাঠ বা অনুবাদ পাঠ করার মাধ্যমে আপনি আপনার শ্রোতাদেরকে কুরআনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আনতে পারেন। এতে আপনার উপস্থাপনার আলোকে তারা কি বুঝতে পারলেন তারা তা অনুধাবন করতে পারেন।

ছয় ঃ এ ব্যাপারে আপনাকে সদা সতর্ক থাকতে হবে যে, আপনি নন, কথা বলবে কুরআন। যারা কুরআনের ভাষা এবং বাণীবাহককে জানতেন, তাদের জন্য কোন ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ছাড়াই কুরআন ফলপ্রসূ হয়েছে। এটা এখনও পর্যন্ত ফলপ্রসূ। শুধু অতিরিক্ত নিজস্ব মতামত আরোপ করেই নয় বরং অতি দীর্ঘ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়েও আপনি কুরআনের বক্তব্যকে ব্যাহত করতে পারেন। আপনার দীর্ঘ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শেষ করতে করতেই আপনার শ্রোতারা কুরআনে কি বলা হয়েছে তা ভুলে যেতে পারেন। সুতরাং প্রথমত ঃ আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন যতটা সম্ভব। দ্বিতীয়ত ঃ কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনেই যদি দীর্ঘ হয়, তবে যতবার পারা যায় মূল পাঠে ততবার ফিরে আসা উচিত। কোনক্রমেই যেন আপনার শ্রোতা এবং কুরআনের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি না হয়। শুধু অর্থের দিক থেকেই নয় বরং শোনার দিক থেকেও।

সাত ঃ আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যা আল কুরআনের ধাঁচে সাজান। হতে পারে সেটাই হবে সাফল্যের নিশ্চয়তা লাভের কার্যকর মাধ্যম।

এটা আপনার নিকট প্রাথমিকভাবে খুব কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে আপনি যতই কুরআনের নিকটবর্তী হবেন, বারবার কুরআন পাঠ করবেন, মুখস্থ করবেন, সেটা ততই আপনার নিজস্ব স্টাইলের অংশে পরিণত হবে।

আপনাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআনিক রচনাশৈলীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে- এক ঃ কুরআনের আবেদন হচ্ছে যুক্তি ও আবেগ উভয়ের প্রতি। দুই ঃ কুরআন হচ্ছে সংক্ষিপ্ত, নির্ভুল, প্রত্যক্ষ, ব্যক্তিগত এবং স্মৃতি জাগিয়ে তোলার মতো। তিন ঃ কুরআন তার শ্রোতাদেরকে পছন্দ ও সিদ্ধান্তের মুখোমুখি করে এবং তাদের মধ্যে কর্ম-প্রেরণা সৃষ্টি করে। চার ঃ এর ভাষা এতই শক্তিশালী যে, কুরআনের বাণী আপনার ভিতরে গভীরভাবে প্রবেশ করে। পাঁচ ঃ যুক্তিগুলো এমনই হয়ে থাকে, যা শ্রোতারা বুঝতে পারেন। কুরআন

তাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকেই উদাহরণ গ্রহণ করে থাকে এবং সর্বদাই তাদের মধ্যে একটি প্রতিধ্বনি দেখতে পায়। এটা বিমূর্ত, যুক্তিসম্মত ও দূরকল্পীও নয়।

আট ঃ বিমূর্ত বক্তব্য পেশ করবেন না। কিংবা কল্পিতকরণ ও নিয়মাবদ্ধকরণের বিনিময়ে কুরআনের গতিশীল প্রভাব বিনষ্ট করবেন না। কিন্তু সঠিক ধারণা ও বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা কুরআনের মর্মবাণী পরিবেশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যদি তা সহজ-সরল ভাষায় শ্রোতাদের হৃদয়ংগম করার মত করে উপস্থাপন করা যায়। কাজের প্রতি আহ্বান, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা অবশ্যই আপনার দারসের অপরিহার্য উপাদান হতে হবে। এটি প্রকৃতি বা ইতিহাসই হোক, নোটিস, বিবৃতি, সংলাপ বা ভাষণই হোক, প্রতিটি ক্ষেত্রে সাড়া দেয়ার জন্য একটি আবেদন, এগিয়ে আসার আহ্বান, কিছু সিদ্ধান্ত, কিছু কাজ ও পদক্ষেপের কথা বলা উচিত।

নয় ঃ কুরআনকে আপনার মতামত উপস্থাপন করার জন্য ব্যবহার করবেন না। বরং আল্লাহর বাণী প্রকাশক বা ব্যাখ্যাকার হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলুন।

দশ ঃ কুরআনকে আপনার শ্রোতাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে দিন, কুরআনকে তাদের অন্তরে স্থান করে নিতে দিন। আপনার উপলব্ধি, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও উদ্বেগকে আলোকিত করতে দিন। এটাই হওয়া উচিত আপনার দারসের তৃষ্ণা।

এগার ঃ আপনার শ্রোতাদের সাড়ার প্রতি আপনাকে সর্বদা মনোযোগী হতে হবে। আপনি যদি মনে করেন কোন একটি যুক্তি শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে পারছে না বা তাদের উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না, সে অবস্থায় তা যতই মূল্যবান বিবেচিত হোক না কেন, যুক্তিটি আপনি সংক্ষেপে বা পরিত্যাগ করতে পারেন। সর্বদাই আপনি পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বা দাবী মনে করলে নুতন বিষয়, স্টাইল সংযোজন করতে পারেন। ■

কুরআনের আনুগত্য

প্রথম থেকেই যদি আপনি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করে আপনার জীবনকে আল্লাহর দেয়া কুরআন অনুযায়ী পুনর্গঠন ও পরিবর্তন না করেন, তাহলে কুরআন পাঠ আপনার কোন উপকারেই আসবে না, বরং তা ক্ষতি ও দুর্দশার কারণ হতে পারে। কর্মানুষ্ঠানের দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রয়াস ব্যতীত হৃদয় ও আত্মার আবেগানুভূতি, কিংবা ভাবের উচ্ছ্বাস অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধি আপনার কোন কাজেই আসবে না। যদি আপনার কাজের উপর কুরআনের কোন প্রভাব ফুটে না ওঠে এবং কুরআন যে নির্দেশ দিয়েছে আপনি তা প্রতিপালন না করেন এবং যা নিষিদ্ধ করেছে তা বর্জন না করেন, তাহলে আপনি কুরআনের নৈকট্য লাভ করতে পারবেন না।

কুরআনের প্রতিটি পাতায় রয়েছে আত্মনিবেদনের আহ্বান, পরিবর্তন ও কর্মানুষ্ঠানের ডাক। প্রতিটি স্তরেই পাঠককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রতিশ্রুতির মুখোমুখি হতে হয়। যারা কুরআনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণে ব্যর্থ হয়, তাদের কাফির, যালিম ও ফাসিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে (আল মায়িদা ঃ ৪৪-৪৭)।

যাদেরকে আল্লাহর এ মহাগ্রন্থ দেয়া হয়েছে অথচ তারা তা বুঝে না কিংবা তদনুযায়ী কাজ করে না, তাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে এমন গাধা হিসেবে, যারা ওজন বহন করে কিন্তু তারা জানে না কি বহন করছে এবং তা থেকে না হতে পারে উপকৃত। তারা হচ্ছে সেই হতভাগা, যাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিচারের দিন অভিযোগ করবেন ঃ

"হে আমার আল্লাহ, আমার জাতির লোকেরা এই কুরআনকে উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিয়েছিল" (আল ফুরকান ঃ ৩০)।

কুরআনকে এড়িয়ে চলা, পরিত্যাগ করা এবং এক পাশে রেখে দেয়ার অর্থ হচ্ছে কুরআন না পড়া, না বুঝা, কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা না করা, এটাকে অপ্রাসংগিক এবং অতীতের বিষয় বলে মনে করা।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআন মেনে চলার ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং জোর দিয়েছেন।

আমার উম্মতের মধ্যে অনেক মুনাফিক হবে কুরআনের পাঠকদের মধ্য থেকে (মুসনাদে আহমাদ)।

সেই ব্যক্তি বিশ্বাসীই নয়, যে কুরআন যা হারাম করেছে, তাকে হালাল বিবেচনা করে (জামে আত্ তিরমিযী)।

কুরআন পাঠ কর, যাতে তুমি নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার সামর্থ্য অর্জন করতে পার। এটা যদি তোমাকে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত না রাখে, তাহলে বুঝতে হবে সত্যিকার অর্থে কুরআন পাঠ করাই হয়নি (আত্ তাবরানী)।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের নিকট কুরআন শিক্ষার অর্থ ছিল, কুরআন পাঠ করা, এ নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা, কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়িত করা।

বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

যারা কুরআন অধ্যয়নে নিয়োজিত ছিলেন তারা বলেছেন যে, উসমান ইবন আফফান এবং আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর মতো লোক যাঁরা একবার দশটি আয়াত শিখলে আর সামনে অগ্রসর হতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তা বুঝতে এবং জীবনে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম না হতেন। তাঁরা বলতেন যে, তাঁরা কুরআন ও জ্ঞান একই সাথে শিখেছেন। আর এভাবেই অনেক সময় তাঁরা একটিমাত্র সূরা শিখতে বছরের পর বছর সময় লাগিয়ে দিতেন (আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন, সুয়ূতী)।

আল হাসান আল-বসরী বলেছেন, তুমি রাত্রিকে গ্রহণ করেছো একটি উটের মতো যাতে আরোহণ করে তুমি কুরআনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে পারো। তোমার সামনে যারা আছেন, তারা এটাকে বিবেচনা করেছেন তাদের প্রভুর বাণী হিসেবে। তারা তার উপর চিন্তা করে রাতে এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে দিনে (ইয়াহিয়া)।

কুরআনের অধ্যয়ন হৃদয়ে বিশ্বাসকে মযবুত করে দেয়া উচিত, যে বিশ্বাস জীবনকে একটি বিশেষ রূপ দান করবে। এটা কোন পর্যায়ক্রমিক খণ্ড খণ্ড প্রক্রিয়া নয় যে, প্রথম কয়েক বছর আপনি কুরআন পাঠ করে কাটাবেন, তারপর বুঝার জন্য এবং বিশ্বাসকে মযবুত করার জন্য কয়েক বছর সময় নিবেন এবং তারপর মাত্র তা বাস্তবায়ন করবেন। গোটাটাই একটি একক প্রক্রিয়া। সবকিছু চলবে যুগপৎভাবে। যখনই আপনি কুরআন শ্রবণ করেন অথবা তিলাওয়াত করেন তা আপনার অন্তরে বিশ্বাস প্রজ্বলিত করে। আর যখনই আপনার হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মে, তখনই আপনার জীবনে পরিবর্তনের সূচনা হয় ।

যা আপনাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে তা হচ্ছে কুরআন অনুযায়ী জীবন ধারণের জন্য শর্ত হলো আপনার জীবনের একটি মুখ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আপনার চারদিকে যে ধরনের চিন্তা-ভাবনাই থাক না কেন, আপনার সমাজ আপনাকে যা-ই নির্দেশ করুক না কেন, অথবা অন্যরা যাই করুক না কেন, আপনাকে আপনার জীবনের গতিধারাকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিতে হবে। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনেক বড় ত্যাগ প্রয়োজন। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর বাণী কুরআনে বিশ্বাসী হিসেবে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত না হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের সাথে সময় যতই দেন না কেন ফলাফল খুব ভালো আসবে না।

প্রথম মুহূর্ত থেকেই প্রথম পদক্ষেপেই এটা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, কুরআন তাদের জন্যই দিক-দর্শন, যারা আল্লাহর নাফরমানির ক্ষতি থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য প্রস্তুত, যারা আল্লাহর অসন্তোষ থেকে নিজেদের বাঁচাতে চায় এবং পরিণতিকে ভয় করে, তারাই হচ্ছেন মুত্তাকী (আল বাকারা ঃ ১-৫)। কুরআন জ্ঞান এবং কর্মের মধ্যে, ঈমান এবং সৎ কাজের মধ্যে বিপরীতধর্মিতা স্বীকার করে না।

কুরআনী মিশনের পরিপূর্ণতা

কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনার অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আপনার চারপাশের লোকদের নিকট কুরআনের বাণী পৌঁছানো। প্রকৃতপক্ষে যে মুহূর্তে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর প্রথম ওহী নাযিল হলো, তখনই তিনি তা তাঁর লোকদের কাছে পৌঁছানোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য

অনুধাবন করেছিলেন। দ্বিতীয় ওহী আসলো এই নির্দেশসহ ঃ জাগো এবং সতর্ক করো (আল মুদ্দাস্‌সির ঃ ২)। অতঃপর বিভিন্ন পর্যায়ে এটা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পরিষ্কার করা হয় যে, কুরআন অন্যকে জানানো, শ্রবণ করানো এবং এর ব্যাখ্যা করা তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব, তার জীবনের মিশন (আল আনআম ঃ ১৯, আল ফুরকান ঃ ১, আল আনআম ঃ ৯৭, আল আরাফ ঃ ১৫৭)।

আমরা তাঁর অনুসারী হিসেবে, আল্লাহর কিতাবের অধিকারী হিসেবে আমাদের উপরও একই দায়িত্ব মিশন অর্পিত হয়েছে। কুরআন পাঠ মানেই হচ্ছে তা অন্যকে জানাতে বাধ্য, কুরআন শোনার অর্থ হচ্ছে অন্যকে শুনাতে হবে। অবশ্যই আমাদের এটা মানবজাতিকে জানাতে হবে এবং কুরআনকে গোপন রাখা যাবে না।

"এই আহলে কিতাবদের সেই ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দাও, যা আল্লাহ তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তা এই যে, তোমাদেরকে কিতাবের শিক্ষা ও ভাবধারা লোকদের মধ্যে প্রচার করতে হবে, এটা গোপন করে রাখতে পারবে না। কিন্তু তারা কিতাবকে পিছনের দিকে ফেলে রেখেছে এবং সামান্য মূল্যে তাকে বিক্রয় করেছে, তারা যা করেছে, তা কতই না খারাপ কাজ" (আলে ইমরান ঃ ১৮৭)।

যদি আপনার হৃদয়ে এবং হাতে একটি প্রদীপ থাকে, তা অবশ্যই আলো বিচ্ছুরিত করবে। আপনার অন্তরে যদি আগুন থাকে, তা অবশ্যই প্রজ্বলিত হবে। সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থে যারা তা করে না, প্রকৃতপক্ষে তারা আগুন দিয়ে তাদের পেট ভর্তি করছে।

"বস্তুত যারা আল্লাহর দেয়া কিতাবের আদেশ-নিষেধ গোপন করে এবং সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের জন্য তাকে বিসর্জন দেয়, তারা মূলত ঃ নিজেদের পেট আগুনের দ্বারা ভর্তি করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ কখনই তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র বলেও ঘোষণা করবেন না। তাদের জন্য কঠিন পীড়দায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে" (আল বাকারা ঃ ১৭৪)।

তারা আল্লাহর অভিশপ্ত হওয়ার উপযোগী ঃ

"যারা আমাদের নাযিল করা উজ্জ্বল আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা গোপন করে রাখবে অথচ আমরা তা সমগ্র মানুষের পথ-প্রদর্শনের জন্য নিজ কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহও তাদের উপর লানত করছেন, আর অন্যান্য সকল লানতকারীরাও তাদের উপর অভিশাপ নিক্ষেপ করছে" (আল বাকারা ঃ ১৫৯)।

যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দায়িত্ব পালন না করবেন ঃ

"অবশ্য যারা এই অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে বিরত হবে ও নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করে নিবে এবং যা গোপন করেছিলো তা প্রকাশ করতে শুরু করবে, তাদেরকে আমি মাফ করে দিব, প্রকৃতপক্ষে আমি ক্ষমাশীল, তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু" (আল বাকারা ঃ ১৬০)।

কিন্তু তারা যদি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সবার দ্বারাই তারা হবে অভিশপ্ত ঃ

"যারা কুফরীর আচরণ অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমগ্র মানুষের অভিশাপ পড়বে" (আল বাকারা ঃ ১৬১)।

আল্লাহ তাদের প্রতি ফিরেও তাকাবেন না ঃ

"আর যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ প্রতিজ্ঞাসমূহ সামান্য নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে ফেলে পরকালে তাদের জন্য কোন অংশই নির্দিষ্ট নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি চেয়ে দেখবেন, আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন, বরং তাদের জন্য তো কঠিন ও উৎপীড়ক শাস্তি রয়েছে (আলে ইমরান ঃ ৭৭)।

নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন আজকের মুসলিমদের প্রতি তাকিয়ে দেখুন। কেন কোটি কোটি লোক রাত-দিন কুরআন পাঠ সত্ত্বেও আমাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না? হয় আমরা কুরআন পড়ি এবং তা বুঝি না, অথবা যদি আমরা

বুঝি, তা আমরা গ্রহণ করি না এবং তদনুযায়ী কাজ করি না, অথবা সম্পূর্ণটাই যখন পড়ি এবং অংশ বিশেষ পালন করি, তখন আমরা নিকৃষ্ট অপরাধের দায়ে একে গোপন রাখা এবং কুরআনের আলোকে বিশ্বের মানুষের সামনে না আনার অপরাধে দোষী।

তাদের মধ্যে আকেরটি দল আছে, যারা উম্মী, আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। নিজেদের ভিত্তিহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা-বাসনাই তাদের একমাত্র সম্বল এবং অমূলক ধারণা-বিশ্বাস দ্বারা তারা পরিচালিত হয়। তাই সেই সব লোকের ধ্বংস নিশ্চিত, যারা নিজেদেরই হাতে শরীয়তের বিধান রচনা করে এবং তারপর লোকদের বলে যে, এর বিনিময়ে তারা সামান্য স্বার্থ লাভ করবে। বস্তুতঃ তাদের হাতের এই লিখনই তাদের ধ্বংসের কারণ এবং এর সাহায্যে তারা যা কিছু উপার্জন করে, তা তাদের ধ্বংসের উপকরণ" (আল বাকারা ঃ ৭৭-৭৮)।

"তবে তোমরা কি কিতাবের একটি অংশ বিশ্বাস কর এবং অন্য অংশ অবিশ্বাস কর? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে, তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছ, তা আল্লাহ মোটেই অজ্ঞাত নন" (আল বাকারা ঃ ৮৫)।

এ সম্পর্কে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কুরআন অধ্যয়নের ফলে আমাদের উপর যা অর্পিত হয়েছে সেই কুরআনের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে না পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালিত হতে পারে না। কলংক, অমর্যাদা, অপমান এবং পশ্চাৎপদতা যা আমাদের ভাগ্যে পরিণত হয়েছে, তার একমাত্র কারণ কুরআন ও তার মিশনের প্রতি আমাদের আচরণ।

এই কিতাবের সাহায্যে আল্লাহ কিছু লোককে সম্মানিত করবেন এবং অন্যদেরকে করবেন অধঃপতিত (সহীহ মুসলিম)।

হায় কতই না ভালো হতো যদি তারা তাওরাত, ইনজীল এবং আল্লাহর তরফ থেকে তাদের প্রতি নাযিল করা অন্যান্য কিতাবসমূহকে কায়েম করত, তবে আসমান ও যমীন থেকে তাদের রিয্ক প্রদান করা হতো (আল মায়িদা ঃ ৬৬)।

কুরআনের উপর আমরা যত পাণ্ডিত্যই অর্জন করি না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তা মেনে না চলবো, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের পূর্ণ অর্থ ও সঠিক তাৎপর্য বুঝতে এবং অবিষ্কার করতে আমরা সফল হতে পরবো না। আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সম্মানিত সাহাবা কিরামকে বলেন ঃ

তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকবে, যাদের নামাযের সাথে তোমার নামাযকে তুলনা করবে, তোমার রোযার সাথে তাদের রোযা, তোমার সুকৃতির সাথে তাদের সুকৃতি, তোমাকে খুবই নিম্নস্তরের মনে হবে। তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের গলার নীচে প্রবেশ করবে না (সহীহ্ আল বুখারী)।

আত্মসমপর্ণ এবং মেনে চলাটা কেবল কুরআনের সত্যিকার মিশন পূর্ণ করার জন্যই নয়। এটি কুরআন বুঝার এক নিশ্চিত কুঞ্জিকা বা চাবি। কুরআনের নির্দেশ মেনে চলে আপনি যে তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পারবেন, তা কেবল চিন্তা-ভাবনা করে সম্ভব নয়। তখন আপনি কুরআনকে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। এ সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) অবিস্মরণীয় ভাষায় লিখেছেন, যা কোন দিন ভুলার মতো নয়।

'কিন্তু কুরআন বুঝার এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে কাজ করার বিধান ও নির্দেশ দিয়ে কুরআন এসেছে কার্যতঃ ও বাস্তবে তা না করা পর্যন্ত কোনও ব্যক্তি কুরআনের প্রাণসত্তার সাথে পুরোপুরি পরিচিত হতে পারে না। এটা নিছক কোন মতবাদ ও চিন্তাধারার বই নয়। কাজেই আরাম কেদারায় বসে বসে এ বইটি পড়লে এর সব কথা বুঝতে পারা যাবার কথা নয়। দুনিয়ার প্রচলিত ধর্মচিন্তা অনুযায়ী এটি নিছক একটি ধর্মগ্রন্থ নয়। মাদ্রাসা ও খানকায় বসে এর সমস্ত রহস্য ও গভীর তত্ত্ব উদ্ধার করা সম্ভব নয়। শুরুতে ভূমিকায় বলা হয়েছে, এটি একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের কিতাব। সে এসেই এক নীরব প্রকৃতির সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে নির্জন ও নিঃসর্গ জীবন ক্ষেত্র থেকে বের করে এনে আল্লাহ

বিরোধী দুনিয়ার মুকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তার কণ্ঠে যুগিয়েছে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ধ্বনি। যুগের কুফরী, ফাসিকী ও ভ্রষ্টতার পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে তাকে প্রচণ্ড সংঘাতে লিপ্ত করেছে। সচ্চরিত্রসম্পন্ন লোকদেরকে প্রতিটি গৃহাভ্যন্তর থেকে খুঁজে বের করে এনে সত্যের আহবায়কের পতাকাতলে সমবেত করেছে। দেশের প্রতিটি এলাকার ফিতনাবাজ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে সত্যানুসারীদের সাথে তাদের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। এক ব্যক্তির আহ্বানের মাধ্যমে নিজের কাজ শুরু করে খিলাফতে ইলাহীয়ার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পূর্ণ তেইশ বছর ধরে এই কিতাবটি এই বিরাট ও মহান ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেছে। হক ও বাতিলের এই সুদীর্ঘ ও প্রাণান্তকর সংঘর্ষকালে প্রতিটি মনযিল ও প্রতিটি পর্যায়েই সে একদিকে ভাংগার পদ্ধতি শিখিয়েছে এবং অন্যদিকে পেশ করেছে গড়ার নকশা। এখন বলুন, যদি আপনি ইসলাম ও জাহিলিয়াত এবং দীন ও কুফরীর সংগ্রামে অংশগ্রহণই না করেন, যদি এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মনযিল অতিক্রম করার সুযোগই আপনার ভাগ্যে না ঘটে, তাহলে নিছক কুরআনের শব্দগুলো পাঠ করলে তার সমুদয় তত্ত্ব আপনার সামনে কেমন করে উদঘাটিত হয়ে যাবে? কুরআনকে পুরোপুরি অনুধাবন করা তখনই সম্ভব, যখন আপনি নিজেই কুরআনের দাওয়াত নিয়ে উঠবেন, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার কাজ শুরু করবেন এবং এই কিতাব যেভাবে পথ দেখায়, সেভাবেই পদক্ষেপ নিতে থাকবেন। একমাত্র তখনই কুরআন নাযিল সময়কালীন অভিজ্ঞতাগুলো আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন। মক্কা, হাবশা (বর্তমান ইথিয়োপিয়া) ও তায়িফের মনযিলও আপনি দেখবেন। বদর ও উহুদ থেকে শুরু করে হুনাইন ও তাবুকের মনযিলও আপনার সামনে এসে যাবে। আপনি আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মুখোমুখি হবেন। মুনাফিক ও ইয়াহুদীদের সাক্ষাতও পাবেন। ইসলামের প্রথম যুগের উৎসর্গিতপ্রাণ মু'মিন থেকে নিয়ে দুর্বল হৃদয়ের মু'মিন পর্যন্ত সবার সাথেই আপনার দেখা হবে। এটা এক ধরনের 'সাধনা' একে আমি বলি 'কুরআনী সাধনা'। এই সাধন পথে ফুটে ওঠে এক অভিনব দৃশ্য। এর যতগুলো মনযিল অতিক্রম করতে থাকবেন, তার প্রতিটি মনযিলে কুরআনের কিছু আয়াত ও সূরা আপনা-আপনি আপনার সামনে এসে যাবে। তারা আপনাকে বলতে থাকবে এই

মনযিলে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সেখানে এই বিধানগুলো এনেছিল। সে সময় অভিধান, ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রীয় কিছু তত্ত্ব সাধকের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যেতে পারে কিন্তু কুরআন নিজের প্রাণসত্তাকে তার সামনে উন্মুক্ত করতে কার্পণ্য করবে; এমনটি কখনও হতে পারে না। আবার এই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের বিধানসমূহ, তার নৈতিক শিক্ষাবলী, তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিধি-বিধান এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে তার প্রণীত নীতি-নিয়ম ও আইনসমূহ বুঝতে পারবে না, যতক্ষণ না সে বাস্তবে নিজের জীবনে এগুলো কার্যকর করে দেখবে। যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের অনুসৃতি নেই, সে তাকে বুঝতে পারবে না। আর যে জাতির সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান কুরআন বিবৃত পথ ও কর্মনীতির দিকে চলে না তার পক্ষেও এর সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর নয়।

রাসূল (সা) নির্দিষ্টভাবে কি পড়েছেন বা জোর দিয়েছেন

কুরআন শরীফে এমন কিছু সূরা ও আয়াত রয়েছে, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐসব সূরা ও আয়াত নির্দিষ্ট নামাযে অথবা বিশেষ পরিস্থিতিতে বেশি বেশি তিলাওয়াত করতেন, অথবা ঐসব সূরা ও আয়াতের চমৎকার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী ব্যাখ্যা করে বিশেষভাবে উচ্চ প্রশংসা করতেন। ঐসব সূরা ও আয়াত সম্পর্কে আপনার জানা উচিত।

নীচে যে হাদীস দেয়া হয়েছে, তা এটা প্রমাণের জন্য নয় যে, কুরআনের এক অংশ অপেক্ষা অন্য অংশ শ্রেষ্ঠ। আপনার উচিত হবে না যে, আপনি কুরআনের বাকী অংশ অবহেলা করেন এবং তার বিনিময়ে ঐ নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করতে বা মুখস্থ করতে আপনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই বাছাইকৃত অংশসমূহ এ জন্যই প্রয়োজনীয় যে, কারো পক্ষে সবকিছু প্রতিদিন মুখস্থ এবং পাঠ করা সম্ভব নয়। তাছাড়াও কেউ সাধারণত ঃ একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিত পড়তে নিজেকে অভ্যস্ত করতে পারে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ এবং তিনি যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার আশা করা ব্যতীত আর উত্তম কি হতে পারে।

এটা স্মরণ রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত কুরআন মাজীদ রমযান মাসে কমপক্ষে একবার পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি সূরা আল বাকারা এবং আলে-ইমরানের মত দীর্ঘ অংশ রাত্রিকালীন নামাযে এক রাকাআতেও পাঠ করতেন।

রাসূল (সা) বিভিন্ন নামাযে যা তিলাওয়াত করতেন

জাবির ইবন সামূরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা ক্বাফ এবং অনুরূপ সূরা তিলাওয়াত করতেন (সহীহ মুসলিম)।

তিনি আল ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করেছেন (জামে আত্ তিরমিযী)।

আমর ইবন হুরাইস (রা) বলেন, আমি তাঁকে আত্ তাকবীর তিলাওয়াত করতে শুনেছি (সহীহ মুসলিম)।

আবদুল্লাহ ইবন আস সাইব (রা) বলেন, তিনি যখন মক্কায় ছিলেন সূরা মুমিনূন-এর ৪৫ অথবা ৫০ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করেছেন (সহীহ মুসলিম)।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, তিনি সূরা কাফিরূন এবং ইখলাস তিলাওয়াত করতেন (সহীহ মুসলিম)।

উকবা ইবন আমির (রা) বলেন, তিনি সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তিলাওয়াত করতেন (মুসনাদে আহমাদ, সুনান আবু দাউদ)।

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি সূরা আল বাকারা (১৩৬) এবং সূরা আলে ইমরানের (৬৪) অংশবিশেষ তিলাওয়াত করতেন (সহীহ মুসলিম)।

আবু বকর (রা) আল বাকারা তিলাওয়াত করেছেন বলে বর্ণিত আছে (আল মুয়াত্তা)।

উসমান ইবন আফফান (রা) প্রায়ই সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করতেন (আল মুয়াত্তা)।

উমর ইবন খাত্তাব (রা) সূরা ইউসুফ এবং সূরা আলহাজ্জ তিলাওয়াত করতেন।

উমর (রা) আবু মুসা (রা)কে লিখেছিলেন তিওয়ালে মুফাস্সাল অর্থাৎ সূরা মুহাম্মাদ থেকে সূরা আল-বুরূজ পর্যন্ত তিলাওয়াত করার জন্য। (জামে আত্ তিরমিযী)।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, ফজরের নামাযের আগের দুই রাকআতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন (ইবনে মাজাহ)।

ফজরের নামায

আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, শুক্রবারের ফজরের নামাযে তিনি প্রথম রাকআতে সূরা আস্ সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে আদ-দাহ্র তিলাওয়াত করতেন।

যোহর ও আসর নামায

জাবির ইবন সামুরা (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী যোহর এবং আসরের নামাযে সূরা আল লাইল এবং অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী আল-আলা পড়তেন (সহীহ মুসলিম)।

জাবির ইবন সামুরার বর্ণনা মতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা আল-বুরূজ এবং আত-তারিক এবং অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন।

উমর (রা) আবু মুসা (রা)কে লিখেন আওসাতে মুফাস্সাল অর্থাৎ সূরা আল-বুরূজ থেকে আল-বাইয়েনা পর্যন্ত পড় (জামে আত্ তিরমিযী)।

মাগরিব নামায

উম্মে ফযল (রা) বলেন, মাগরিবের নামাযে আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আল-মুরসালাত পাঠ করতে শুনেছি (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

জারীর ইবনে মুতইম বলেন, আমি তাঁকে সূরা তুর পাঠ করতে শুনেছি (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, তিনি আল-কাফিরূন, আল-ইখলাস পড়তেন (ইবনে মাজাহ)। জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) বলেন, বিশেষ করে শুক্রবার রাতে (শারহি সুন্নাহ)।

আবদুল্লাহ ইবন উতবাহ (রা) বলেন, তিনি সূরা আদ-দুখান তিলাওয়াত করতেন (সুনান আন্ নাসাঈ)।

আয়িশা (রা) বলেন, তিনি সূরা আল-আরাফ পড়তেন (সুনান আন্ নাসাঈ)।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, মাগরিবের নামাযের পরের দুই রাকআতে তিনি সূরা কাফিরূন এবং ইখলাস পড়তেন (জামে আত্ তিরমিযী)।

উমর (রা) আবু মুসা (রা)কে লিখেছিলেন কাস্‌রে মুফাস্‌সাল অর্থাৎ সূরা আল বাইয়েনা থেকে নাস পর্যন্ত পাঠ কর (জামে আত্ তিরমিযী)।

ইশার নামায

জারীর (রা) বলেন, তিনি মুয়াজ ইবন জাবালকে সূরা আশ-শামস, আদ-দুহা, আল-লাইল এবং আল আলা এবং সূরা বাকারার চাইতে দীর্ঘ এমন সূরা পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

আল-বারা (রা) বলেন, আমি তাকে সূরা ত্বীন পড়তে শুনেছি (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

জুমআ এবং ঈদ

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, জুমআর নামাযে আমি তাকে প্রথম রাকআতে সূরা জুমআ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুনাফিকুন পড়তে শুনেছি (সহীহ মুসলিম)।

নুমান ইবন বশীর (রা) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমআ এবং ঈদ উভয় নামাযেই সূরা আল-আলা এবং আল-গাসিয়াহ পাঠ করতেন এবং যদি জুমআ ও ঈদ একই দিনে পড়তেন, তবে একই সূরা দুটোতেই পড়তেন (সহীহ মুসলিম)।

ওয়াফিক আল-লাইছী (রা) বলেন, তিনি ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে সূরা ক্বাফ এবং সূরা কামার পড়তেন (সহীহ মুসলিম)। ■

৯ ঃ নবী (সা) বিভিন্ন সময়ে যা পড়তেন

তাহাজ্জুদ

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তিনি আকাশের দিকে তাকাতেন এবং ইন্না ফী খালকিস..........থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করতেন (আলে ইমরান ঃ ১৯০-২০০ [সহীহ্ আল বুখারী])।

সকাল ও সন্ধ্যায়

আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) বলেন, সকালে এবং সন্ধ্যায় তিনবার করে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ কর। যে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এটা তোমার জন্য যথেষ্ট (জামে আত্ তিরমিযী, সুনান আবু দাউদ)।

আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, যে কেউ সকালে আতয়াতুল কুরসী এবং হা-মীম আল-মাসীর (আল-মু'মিন ঃ ২-৩) তিলাওয়াত করবেন আল্লাহ্ তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হিফাযাত করবেন এবং যে কেউ সন্ধ্যায় তিলাওয়াত করবেন আল্লাহ্ তাকে সকাল পর্যন্ত হিফাযাত করবেন (জামে আত্ তিরমিযী)।

মীকাঈল ইবন ইয়াগার (রা) বলেন, যদি কেউ সকালে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত (২২-২৪) পাঠ করেন, তাহলে ৭০ হাজার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত তা জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। যদি সন্ধ্যায় পাঠ করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে (জামে আত্ তিরমিযী)।

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, কেউ যদি সূরা রূমের তিন আয়াত (১৭-১৯) সকালে পাঠ করে, তাহলে দিনের বেলায় কোন ভালো কাজে অবহেলা করলেও তার জন্য পুরস্কৃত করা হবে এব যদি সন্ধ্যায় পাঠ করে, তাহলে রাতের বেলায় কোন ভালো উপেক্ষা করলেও তার জন্য পুরস্কৃত করা হবে (সুনান আবু দাউদ)।

শয়নের আগে বা রাতে

আবু হুরাইরা (রা) শয়তানের সাথে তাঁর মুখোমুখি হওয়া সম্পর্কিত দীর্ঘ এক

হাদীসে বলেন, শয়নের সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ কর। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষী তোমার জন্য নিয়োজিত হবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না (সহীহ্ আল বুখারী)।

আয়িশা (রা) বলেন, যখন তিনি শয়ন করতে যেতেন, তখন হাত দুটো সংযুক্ত করে তাতে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁ দিতেন। অতঃপর তিনি যতটা সম্ভব মাথা, মুখমন্ডল, শরীরের সামনের অংশ হাত দিয়ে মুছে ফেলতেন। এটা তিনি তিনবার করতেন (সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, সূরা আল বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়। যারা এ দুটি আয়াত রাতে পড়ে, তাদের জন্য তা যথেষ্ট (সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

সূরা আলে ইমরানের শেষ অংশ (১৯০-২০০) পাঠ করলে তা তোমাকে রাত্রিকালীন সতর্ক প্রহরীর মত পুরস্কারে ভূষিত করবে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, সূরা আদ দুখান পড়লে ৭০ হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তোমার জন্য মাগফিরাত চাইতে থাকে (জামে আত্ তিরমিযী)।

আল-ইরবাদ ইবন সারিয়া (রা) বলেন, মুসাব্বিহাত/আল ইসরা, আল হাদীদ, আল-হাশর, আস্-সাফ, আল-জুমআ, আত-তাগাবুন, আল-আ'লা পাঠ কর। তিনি ঘুমানোর আগে এইসব সূরা তিলাওয়াত করতেন এবং বলতেন, এসবের একটি আয়াত এক হাজার আয়াতের চেয়ে উত্তম (সুনান আবু দাঊদ, জামে আত্ তিরমিযী)।

জাবির (রা) বলেন, আস্ সাজদা ও আল মুলক তিলাওয়াত না করে তিনি ঘুমাতেন না (মুসনাদে আহমাদ, জামে আত্ তিরমিযী)। ■

১০ ঃ বিভিন্ন সূরার ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (সা) যা বলেছেন

সূরা আল ফাতিহা

আবু সাঈদ আল-মুয়ালা (রা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দিব না, যা কুরআনের সবচেয়ে মহান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা বললেন এবং অতঃপর সূরা ফাতিহা শিক্ষা দিলেন এবং বললেন যে, সাবউল মাছানী ও কুরআনে আযীম আমাকে দেয়া হয়েছে এটিই তাই (সহীহ্ আল বুখারী)।

আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একজন ফেরেশতা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেন, দু'টি আলোর জন্য আনন্দ প্রকাশ করুন, যা আপনাকে দেয়া হয়েছে, অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। এর একটি হচ্ছে সূরা ফাতিহা এবং অপরটি হচ্ছে সূরা বাকারার শেষ আয়াত (আল বাকারা ঃ ২৮৫-২৮৬ [সহীহ্ মুসলিম])

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার আত্মা, সূরা ফাতিহার মত কোন কিছুই তাওরাতে অবতীর্ণ হয়নি, ইনজীলে নয়, যাবুরে নয়, কুরআনেও নয় (জামে আত্ তিরমিযী)।

আবদুল মালিক ইবন উমায়ের (রা) বলেন, প্রতিটি রোগে এটি এক নিরাময় (আদ্ দারিমী)।

সূরা ফালাক ও নাস

উকবা ইবন আমির বলেন, এর মত কখনও দেখা যায়নি (সহীহ্ মুসলিম)।

কোন আশ্রয় প্রার্থনাকরী আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে না এই দুই সূরার মত অন্য কিছু দিয়ে (সুনান আবু দাউদ)।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এক রাকআতে

কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়তে পারবে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন এবং নির্দেশ দিলেন, সূরা ইখলাস পড়, কারণ এটি কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

আয়িশা (রা)-এর বর্ণনা মতে, যে ব্যক্তি প্রতি নামাযে এই সূরা তিলাওয়াত করেন, তার সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তাকে বল যে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

আনাস (রা) বলেন, সূরা ইখলাসকে ভালোবাসেন একজনকে তিনি বললেন, এই সূরার প্রতি আপনার ভালোবাসা আপনাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে (সহীহ আল বুখারী, জামে আত্ তিরমিযী)।

সূরা কাফিরূন

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এবং আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, এটি কুরআনের চার ভাগের এক ভাগের সমান (জামে আত্ তিরমিযী)।

সূরা নসর

আনাস (রা) বলেন, এটি কুরআনের চার ভাগের এক ভাগ (জামে আত্ তিরমিযী)।

সূরা আত্ তাকাছুর

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি একদিনে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করতে পার না? অতঃপর বললেন, তোমাদের কেউ কি সূরা আত্ তাকাছুর পড়তে পার না (বায়হাকী)?

সূরা যিলযাল

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) ও আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, এটি অর্ধেক কুরআনের সমান (জামে আত্ তিরমিযী)।

আয়াতুল কুরসী (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫)

উবাই ইবন কাআব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো আল্লাহর গ্রন্থে কোন্ আয়াতটি শ্রেষ্ঠতম? এবং অতঃপর যখন বলা হলো তা হচ্ছে আয়তুল কুরসী, তখন তিনি অনুমোদন করলেন (সহীহ মুসলিম)।

আমানার রাসূল (আল বাকারা ঃ ২৮৫-৮৬)

আবদুলাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এর আগে কোন নবীই এর মত কোন আলো নিয়ে আসেন নি (সহীহ্ মুসলিম)।

নুমনা ইবন বশীর (রা) বলেন, যে কোন গৃহে এটি তিলাওয়াত করা হোক না কেন, তিন রাত্রি পর্যন্ত শয়তান এর কাছেই আসতে পারে না (জামে আত্ তিরমিযী)।

আইফা ইবন আবদুল কিলাই (রা) বলেন, এটি আল্লাহর সিংহাসনের নিচে তাঁর করুণার ভান্ডার থেকে উৎসারিত যা তিনি ওই উম্মতকে দিয়েছেন, দুনিয়া ও আখিরাতে এমন কোন কল্যাণ নেই, যা এতে অন্তর্ভুক্ত নয় (আদ্ দারিমী)।

আবুযার (রা) বলেন, এটি শিখো এবং স্ত্রী ও সন্তানদের শিক্ষা দাও, কারণ এ হচ্ছে একটি আশীর্বাদ, একটি আবৃত্তি এবং একটি নিবেদন (আল হাকিম)।

সূরা আল বাকারা ও আলে ইমরান

আবু উমামা (রা) বলেন, উজ্জ্বল দীপ্তিমান দু'টি সূরা পাঠ কর। কারণ কিয়ামতের দিন তাদের সাথীদের জন্য সুপারিশ করতে করতে তারা দু'টি মেঘখণ্ড, দু'টি ছায়া এব দুই পাল পাখির মত ভেসে আসবে (সহীহ্ মুসলিম)।

নাওয়াস ইবন মামান (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন কুরআনকে তার সংগীদের সাথে আনা হবে। যারা কুরআন অনুযায়ী কাজ করে থাকে তাদের সামনে থাকবে সূরা আল বাকারা এবং আলে-ইমরান। এদেরকে দু'টি কালো মেঘ খণ্ড অথবা আলোধারণ বা দুই পাল পাখির মত মনে হবে এবং এরা সাথীদের জন্য সুপারিশ করতে থাকবে (সহীহ্ মুসলিম)।

সূরা আল বাকারা

আবু হুরাইরা (রা) বলেন কুরআন তিলাওয়াত পরিত্যাগ করে তোমার বাড়ীকে কবরস্থানে পরিণত কর না। সেই বাড়ী থেকে শয়তান পলায়ন করে, যে বাড়ীতে সূরা আল বাকারা তিলাওয়াত করা হয় (সহীহ্ মুসলিম)।

আবু উমামা (রা) বলেন, সূরা আল বাকারা তিলাওয়াত কর, কেননা এটা অবলম্বন করা আশীর্বাদ এবং ত্যাগ করা ত্রুটি (সহীহ্ মুসলিম)।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, সবকিছুরই একটা ভান্ড থাকে আর কুরআনের ভান্ড হচ্ছে সূরা আল বাকারা (সহীহ মুসলিম)।

সূরা আল আনআম

জাবির (রা) বলেন, এত অসংখ্য ফেরেশতা এ সূরা নাযিলের সময় অবতীর্ণ হন যে, তাদের দ্বারা আকাশের দিগন্ত ঢেকে যায় (হাকিম)।

সূরা কাহাফ

আবু দারদা (রা) বলেন, যে কেউ সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত শিখেন, সংরক্ষণ করেন ও আন্তরিকতার সাথে আমল করেন, তাকে দাজ্জাল থেকে হিফাযত করা হবে (সহীহ মুসলিম)।

সূরা ইয়াসীন

আনাস (রা) বলেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি হৃৎপিণ্ড আছে এবং কুরআনের হৃৎপিণ্ড হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। যে কেউ এটি পাঠ করলে আল্লাহ তার জন্য দশটি কুরআন খতম লিখবেন (জামে আত্ তিরমিযী)।

মাকিল ইবন ইয়মার (রা) বলেন, যিনি সূরা ইয়াসীন পড়েন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেন, আল্লাহ তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেন। সুতরাং তোমরা মৃত্যুকালীন সময়েও এটি পাঠ কর (আল বায়হাকী)।

সূরা আল ফাত্হ

উমর (রা) বলেন, পৃথিবীতে যে কোন জিনিসের চাইতে আমি একে ভালোবাসি (সহীহ আল বুখারী)।

সূরা আর রহমান

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, প্রত্যেক জিনিসেরই একটি অলংকার থাকে এবং কুরআনের অলংকার হচ্ছে সূরা আর রহমান (আল বায়হাকী)।

সূরা ওয়াকিয়া

যে কেউ প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করবেন, তিনি অভাবগ্রস্থ হবেন না।

সূরা আল মূলক

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এই সূরার ৩০টি আয়াত একজন মানুষের জন্য তার

গুনাহ মাফ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য মধ্যস্থতাকারীর কাজ করে (মুসনাদে আহমাদ, জামে আত্ তিরমিযী, সুনান আবু দাউদ)।

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি এটা পছন্দ করি যে, প্রত্যেক বিশ্বাসীর অন্তরে এ সূরা স্থান পাক (হাকিম)।

সূরা আল আলা

আলী (রা) বলেন, তিনি এ সূরাটি ভালবাসেন (মুসনাদে আহমাদ)। ■

১১ ঃ কুরআন অধ্যয়নের জন্য পাঠক্রম

ব্যক্তিগত অধ্যয়ন বা পাঠচক্রের জন্য কুরআনের অনুচ্ছেদসমূহের পাঠক্রমের ধারণা দেয়া একটি খুবই কঠিন কাজ। প্রথমত ঃ কি সংযোজন করতে হবে? সমগ্র কুরআন শরীফ থেকে একটি পর্যাপ্ত এবং সন্তোষজনক বাছাই প্রায় অসম্ভব। কুরআনের প্রতিটি অংশে অতিরিক্ত এবং নতুন কিছু না কিছু বক্তব্য রয়েছে। এমনকি বারবার পুনরাবৃত্তি এবং একই ধরনের অনুচ্ছেদসমূহেরও আলাদা কিছু অন্তর্নিহিত ভাবধারা আছে। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক অনুচ্ছেদ কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক ভাবধারাই সংযোজন করতে পারে। অতএব প্রত্যেক সিলেবাসেই অনেক কিছু সমান বা অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বাদ পড়ে যাবার ত্রুটি থেকে যাবে। উপরন্তু যে কোন নির্ধারিত এপ্রোচ বিধি বহির্ভূত হবে। কুরআনে নয় বরং শুধু বাছাইকারীর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগি ও পছন্দ অপছন্দের প্রকাশ ঘটবে বা ঘটাই স্বাভাবিক। এখানে যে পাঠক্রম দেয়া হলো, তা ব্যবহারের সময় এ সীমাবদ্ধতাগুলোর কথা স্মরণ রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে আপনাকে সজাগ থাকতে হবে যে, যা বাদ রাখা হয়েছে, তাও সমান মূল্যবান এবং আপনি একজন সাধারণ মানুষ, যিনি ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নন তার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ কোথা থেকে শুরু করতে হবে, কোথায় শেষ করতে হবে এবং কোন্ ধারা অবলম্বন করে অগ্রসর হতে হবে? একমাত্র সন্তোষজনক ধারাবাহিকতা হচ্ছে কুরআনের ধারাবাহিকতা, যেভাবে আল্লাহরপক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু একটি সিলেবাস সেই ধারাবাহিকতার পরিবর্তন এড়াতে পারে না। কোন্ মানদণ্ডের ভিত্তিতে? আবার সেটা অবশ্যই বিধি-বহির্ভূত হবে। যে কোন একটি ধারাবাহিকতা অনেক সময় প্রয়োজনীয় ধারাক্রমের মধ্যে একটি বিকল্প হতে পারে। আপনি এভাবেও অগ্রসর হতে পারেন, প্রথমে কুরআনের মর্যাদাকে আল্লাহর অবতীর্ণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন। অতঃপর বিশ্বজগতের প্রমাণগুলোর সাথে পরিচয় করুন। নিজের ব্যক্তিসত্তা ও ইতিহাসের সাথে পরিচিত হওয়া আল্লাহ, আখিরাত ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি বিশ্বাস,

ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক মর্যাদা, মুসলিম জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ঈমান এবং জিহাদের ডাক, আল্লাহর প্রতি প্রতিশ্রুতি ও শপথ পূরণ করা। অথবা কেউ ইচ্ছা করলে মৌলিক বিশ্বাস থেকে শুরু করতে পারেন। যা আমি এখানে উল্লেখ করেছি, যা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পরিবর্তন হতে পারে। ইসলামের আশীর্বাদ সম্পর্কে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে শুরুতেই। পাঠকের জীবনের লক্ষ্য, আল্লাহর প্রতি তাদের শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। এটা আমার সেই উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল বাকারায় ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিমদের প্রতি যেভাবে ভাষণ দিয়েছিলেন।

প্রত্যেক চক্র শুরু হবে একথা আলোচনা করে যে, কিভাবে কুরআন পড়তে ও বুঝতে হয়। এজন্য এই বইটি সহায়ক হওয়া উচিত।

সূরা আল ফাহিতা সম্পর্কে একটি বিশেষ কথা। কুরআন শরীফের মধ্যে এ সূরাটি এক অসাধারণ স্থান দখল করে আছে। কুরআনের অতীব প্রয়োজনীয় অর্থের সবকিছুই এ সূরায় আছে। আপনি প্রতিদিন এটি অনেক বার পড়েন। সুতরাং এটি প্রত্যেক সিলেবাসের অংশ হওয়া উচিত। কিন্তু এর অধ্যয়ন থেকে সত্যিকারের উপকার পেতে হলে একজন শিক্ষানবীসের জন্য একজন ভালো শিক্ষক অথবা তাফসীর গ্রন্থের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন হবে। নির্ধারিত অংশের বিনিময়ে হলেও যেখানেই এ ধরনের সাহায্য পাওয়া যাবে এটাকে অবশ্যই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কুরআন মাজীদের শেষ দিকের সংক্ষিপ্ত সূরাসমূহ যা আপনি দৈনন্দিন নামাযে তিলাওয়াত করেন, তাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঐসব আয়াত সঠিকভাবে বুঝার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হবে। সত্যিকার উপায়-উপকরণ যখন পাওয়া যাবে, তখন ঐসব সূরা অধ্যয়ন করতে হবে।

এখানে দুটি সিলেবাস দেয়া হয়েছে। সংক্ষিপ্ত সিলেবাস যাতে ১২টি অংশ বাছাই করা হয়েছে, তা এক বছরের পাঠচক্র অথবা সংক্ষিপ্ত সময়ের গভীর অধ্যয়নের জন্য। যদি একজন শিক্ষক থাকেন এবং অধ্যয়নের প্রচুর সময় পাওয়া যায়, তাহলে সেটা ১২ সপ্তাহ অথবা ১৪ দিনের শিক্ষা শিবিরের জন্যও উপযোগী

বিবেচিত হতে পারে। এমনকি আরও সংক্ষিপ্ত সময় যেমন ৫-৭ দিনের সিলেবাস উদ্ভাবনের জন্য এটা কাজে লাগতে পারে।

প্রত্যেক বাছাইকৃত অংশের জন্য কিছু বড় বড় দিক উল্লেখ করা হয়েছে আপনি যা দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। কিছু কুরআনী নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে যাতে করে আপনি তার আলোকে চিন্তা করতে পারেন। এসব রেফারেন্স আমার নিজস্ব উপলব্ধির ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে, যা কোনক্রমেই ব্যাপক নয়। আশা করা যায় যে, আপনি নিজেই উদ্যোগ নিতে পারবেন এবং সে সময়ের মধ্যে ঐসবের সাথে আপনার পরিচিতি হয়ে যাবে। দীর্ঘ সিলেবাসটি দেয়া হয়েছে এক বছরের জন্য সাপ্তাহিক পাঠচক্রের উপযোগী করে। ■

১২ ঃ সংক্ষিপ্ত সিলেবাস ঃ ১২টি নির্ধারিত অংশ

মাসিক পাঠচক্রের জন্য ১ বছরের কোর্স

(১) সূরা হাজ্জ ঃ ৭৭-৭৮

চিন্তা করুন ঃ বন্দেগী ও আনুগত্যের জীবন জিহাদে পূর্ণতা, শাহাদাতের মিশনে কেন্দ্রীভূত মুসলিম হওয়ার উদ্দেশ্য, নামায, যাকাত ও রোযার উপকরণসমূহ।

(১.১) রুকু ও সিজদা ঃ ইবাদাত ও আনুগত্যের কর্ম নামায, বিশেষভাবে রাত্রীকালীন নামায, মনের অবস্থা, আচরণের অবস্থা, ব্যক্তিগতভাবে ও প্রকাশ্যে– ২ ঃ ১২৫, ১৬ ঃ ৪৯, ২ ঃ ৪৩, ৭৬ ঃ ২৬, ৩৯ ঃ ৯, ৭৭ ঃ ৪৮, ৫ ঃ ৫৫, ৯৬ ঃ ১৯, ৯ ঃ ১১২, ৪৮ ঃ ২৯, ২ ঃ ৫৮।

(১.২) ইবাদাত ঃ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে, আল্লাহর মূল বাণী, পরিপূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত, সকল মিথ্যা আল্লাহ থেকে ফিরে আসা– ৫১ ঃ ৫৬, ১৬ ঃ ৩৬, ২১ ঃ ২৫, ৪ ঃ ৩৬, ৩৯ ঃ ১১, ৪০ ঃ ৬৬, ১২ ঃ ৪০।

(১.৩) কল্যাণ ঃ অন্তর থেকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে– ৮ ঃ ৭০, ২ ঃ ২৬৯, ২ ঃ ১৮০, ৭৩ ঃ ২০, ৯৯ ঃ ৭।

(১.৪) জিহাদ ঃ এর দাবী– ৪৯ ঃ ১৫, ৮ ঃ ৭৪, ৩ ঃ ১৪২, ৯ ঃ ১৯-২২, ৪ ঃ ৯৫-৯৬, ৬১ ঃ ১১, ৯ ঃ ৪১-৪৫, ৯ ঃ ২৪।

(১.৫) শাহাদাতের মিলনের জন্য বাছাই হওয়া সম্পর্কে– ২ ঃ ১২৮-১২৯, ২ ঃ ১৪৩, ৬ ঃ ১৬১-১৬৪, ৩ ঃ ৬৫-৬৮।

(১.৬) তাওহীদ সম্পর্কে হযরত ইবরাহীমের দৃষ্টান্ত, আনুগত্য, ত্যাগ– ৬ ঃ ৭৯, ৬০ ঃ ৪, ২ ঃ ১৩১।

(১.৭) দীন– ৫ ঃ ৩-৬, ২ ঃ ১৮৫, ৪ ঃ ২৬-২৮।

(১.৮) শাহাদাতের মিশন– ২ ঃ ২১৩, ৩৩ ঃ ৪৫, ৫ ঃ ৬৭, ৪৮ ঃ ৮, ৩ ঃ ১৮৭, ৪ ঃ ৪১, ২ ঃ ১৫৯-১৬৩, ১৭৪-১৭৬।

(১.৯) নামায ঃ গুরুত্ব, কায়েমের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শর্ত– ২ ঃ ৩, ১৯ ঃ ৫৯, ৭০ ঃ ২৩, ৩৪ ঃ ২, ২৩৮ ঃ ৪, ১০২ ঃ ৩, ২ ঃ ২৩৯, ২৯ ঃ ৪৫, ৭ ঃ

২৯, ২৩ ঃ ২, ৪ ঃ ৪৩, ১৭ ঃ ৭৮, ৪ ঃ ১৪২, ২ ঃ ৩৪, ৭ ঃ ৩১, ৬২ ঃ ৯-১১, ১৯ ঃ ৫৫, ১৭৭ ঃ ১-৭, ২২ ঃ ৪১।

(১.১০) যাকাত ঃ গুরুত্ব এবং তাৎপর্য– ৪১ ঃ ৬-৭, ৯ ঃ ৫, ৩০-৩৯, ৯ ঃ ১০৩।

(১.১১) রোযা– ৩ ঃ ১০১, ৩১ ঃ ২২, ২৬ ঃ ৭৭-৮২।

(২) সূরা আল বাকারা ঃ ৪০-৭

চিন্তা করুন ঃ হিদায়াতের আশীর্বাদ স্মরণ করুন এবং অন্যান্য, আল্লাহর প্রতি ওয়াদা পূরণ, ঈমানের নবায়ন, আল্লাহর বাণীর বিনিময়ে সামান্য সুবিধা লাভের ব্যবসায়ে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে ফেলা এবং বিকৃত করা, সত্য গোপন করা, নামায, যাকাত, ইবাদাতে এবং বাইরে সামষ্টিক জীবন, মুনাফিকী এবং দ্বিমুখী নীতি, সবর ও নামায নৈতিক শক্তি হিসেবে।

(২.১) নিয়ামত– হিদায়াতে, প্রকৃতিতে ও ইতিহাসে– ৫ ঃ ৩, ২ ঃ ১৫০, ৫ ঃ ৭, ১৬ ঃ ১৮, ৩ ঃ ১০৩, ৮ ঃ ২৬, ৫ ঃ ২০।

(২.২) ওয়াদা– ৭ ঃ ১১, ৪৮ ঃ ৮-১০, ৭ ঃ ১৭২, ৩৬ ঃ ৬০, ৩৩ ঃ ২১-২৪, ৫ ঃ ১২-১৩, ৩ ঃ ৭৬-৮৬।

(২.৩) আল্লাহর পক্ষ থেকে দরকষাকষি ইহকালে ও পরকালে– ৩ ঃ ১-৩৯, ২৪ ঃ ৫৫, ৫ ঃ ৬৬, ৪ ঃ ৬৬-৯।

(২.৪) ঈমান নবায়নের আহ্বান– ৪ ঃ ১৩৬-১৩৯, ৫৭ ঃ ৭-১৬, ৪ ঃ ৬০-৬১।

(২.৫) ঈমানের বিনিময়ে দুনিয়াবী লাভ– ৫ ঃ ৪৪, ২ ঃ ১৭৪-১৭৬।

(২.৬) সত্যকে মিথ্যা দিয়ে আচ্ছাদিত করা– ২ ঃ ৭৫, ৭৮,৭৯, ৪০, ৪১, ৯১, ৯৪, ১০২, ১১১, ১১৩, ৫ ঃ ১৮।

(২.৭) সত্য গোপন– ২ ঃ ১৫৭-১৬৩, ১৭৪-১৮৬।

(২.৮) নামাযের গুরুত্ব, মাসজিদে জামায়াতে নামায হচ্ছে ইসলামী জামায়াতের মূল কথা– ১৮ ঃ ২৮, ৯ ঃ ১৬-১৭, ২৪ ঃ ৩৬, ২ ঃ ১১৪, ৯ ঃ ১০৭-১০৮।

(২.৯) কথায় এবং কাজে অসামঞ্জস্য, বিশেষ করে দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে– ৬১ ঃ ২-৩, ৬৩ ঃ ১-৪।

(২.১০) আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতি পালনের মূল অবলম্বন সবর ও নামায– ২ ঃ ১৫৩-১৫৭, ৪১ ঃ ৩৫, ৪৬ ঃ ৩৫, ৭ ঃ ১০৭, ৮ ঃ ৪৩, ৩ ঃ ১২৫, ৮ ঃ ৬৫-৬৬।

(২.১১) আল্লাহর নিকট ফিরে আসার ব্যাপারে সতর্কতা ও নিশ্চয়তা– ৫২ ঃ ৪৮।

(৩) সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ১-১০ ও ২০

চিন্তা করুন ঃ রাত্রির নামাযে কুরআন তিলাওয়াত, যিকর, তাবাত্তুল, তাওয়াক্কুল, সবর, সালাত, যাকাত, ইনফাক, ইস্তিগফার।

(৩.১) কিয়ামুল লাইল– ৩২ ঃ ১৫-১৬, ৩৯ ঃ ৯-২৩, ৫১ ঃ ১৫-১৯, ১৭ ঃ ৭৮-৮২।

(৩.২) তাসবীহ– ২০ ঃ ২৪-৩৩।

(৩.৩) তাযকিয়ার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে যিকর– সর্বাবস্থায়, বিভিন্নভাবে, অন্তরে, ভাষায়, দৈহিকভাবে, কর্মে, দাওয়াতে এবং জিহাদে– ৮৭ ঃ ১৫, ৩ ঃ ১৯১, ১৩ ঃ ২৮, ৩৯ ঃ ২২-২৩, ৬২ ঃ ৯, ২ ঃ ১৫০-১৫৫।

(৩.৪) তাওয়াক্কুল ঃ তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা– ৮ ঃ ২-৪, ৬৫ ঃ ৩, ১১ ঃ ১২৩, ১২ ঃ ৬৭, ২৫ ঃ ৫৮, ১৪ ঃ ১২।

(৩.৫) ইয়াফুলুনের বিভিন্নরূপ– ৩৪ ঃ ৮, ২১ ঃ ৫, ২৫ ঃ ৪-৫, ৭, ৬৮ ঃ ৮-১৫, ১৭ ঃ ৯০-৩, ১০ ঃ ১৫, ১৭ ঃ ৭৩।

(৩.৬) করযে হাসানা এবং আল্লাহর পথে খরচ– ৫৭ ঃ ১১-১৬, ৯২ ঃ ১৮-২১, ২৩ ঃ ৬০, ২ ঃ ২৬৪-৭৪, ৩ ঃ ৯২, ৪ ঃ ৩৮, ৫৭ ঃ ১০, ৬৩ ঃ ১১, ৩৫ ঃ ২৯।

(৩.৭) ইসতিগফার আল্লাহর বাণীর মূল কেন্দ্রবিন্দু, সতর্কতা, বাছাই, জবাবদিহি, ত্রুটি স্বীকার, প্রত্যাবর্তন, ইহলোক ও পরলোকের পুরস্কার– ৪ ঃ ১১০, ৩ ঃ ১৫-১৭, ৩ ঃ ১৩৩-১৩৬, ৩ ঃ ১৪৬-১৪৮, ৭১ ঃ ৭-১২, ৩৯ ঃ ৫৩, ৬৪ ঃ ১৭।

(৪) সূরা আল হাদীদ ঃ ১-৭

চিন্তা করুন ঃ প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহর গৌরব ঘোষণা করছে, সমস্ত রাজত্ব তাঁর, তিনি জীবন ও মৃত্যুর মালিক, তাঁর ক্ষমতা সবার উপর, তাঁর জ্ঞান সর্ববিষয়ে, তাঁর সার্বভৌমত্ব ও শাসন সবার উপর, কালের উপর, মানুষের অন্তরে কি আছে তাও তিনি জানেন, এর আলোকে ঈমানের আহ্বান এবং আল্লাহর পথে খরচ।

(৪.১) আল্লাহর গুণাবলী– ২২ ঃ ১৮, ১৭ ঃ ৪৪, ১০ ঃ ৩১, ৬, ৫৯ ঃ ৬১, ৩ ঃ ১৫৪, ২৮ ঃ ৭০-৭২, ২ ঃ ২৫৫, ৫৯ ঃ ২২-২৪, ৩ ঃ ২৫-২৬।

(৫) সূরা আন নাহল ঃ ১-২২

চিন্তা করুন ঃ বিশ্বে এবং নিজের মধ্যে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রমাণ। মানুষ, পৃথিবী, জান্নাত, প্রাণীকূলের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, পানি বর্ষণ, ফসল ফলানো, রাত্রি ও

দিন, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, নানা বর্ণ, সমুদ্রে খাদ্য ও সম্পদ, তারকার মাধ্যমেদিক-নির্দেশিকা।

(৫.১) প্রমাণ, বিভিন্ন অনুচ্ছেদে– ৩০ ঃ ১৭-২৭, ২৭ ঃ ৫৯-৬৮, ১০ ঃ ১-১০, ৩১ ঃ ৬।

(৬) সূরা ইয়াসীন ঃ ৫০-৬৫

জীবনের বিভিন্ন স্তরে পথ পরিক্রমা সম্পর্কে চিন্তা করুন। মৃত্যু ও জীবনের শেষ মুহূর্ত, মহাধ্বংস বা কিয়ামতের দিন, আবার জাগ্রত হওয়া, বিচার পুরস্কার ও শাস্তি।

(৬.১) আখিরাত ৫০ ঃ ১৬-৩৫, ৭৫ ঃ ২০-৩০, ১৮ ঃ ৪৭-৯, ২০ ঃ ১০০-১১২, ২২ ঃ ১-৭, ২৩ ঃ ৯৯-১১৮, ৪৩ ঃ ৬৬-৮০, ৪৪ ঃ ৪০-৫৯, ৫১ ঃ ১-২৭।

(৭) সূরা আল হাদীদ ঃ ২০-২৫

চিন্তা করুন ঃ বর্তমান জীবনের বাস্তবতা ও প্রকৃতি। আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্য শক্তি প্রয়োগ।

(৭.১) বর্তমান ও ভবিষ্যতের জীবন– ৩ ঃ ১৪-১৫, ১০৫, ১০ ঃ ২৪, ১৮ ঃ ৪৫, ৪ ঃ ১৩৪, ১৭ ঃ ১৮-১৯, ৪২ ঃ ১৯-২০।

(৭.২) ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা– ৪ ঃ ১৩৫, ৬১ ঃ ৯-১৪।

(৮) সূরা আল আনকাবুত ঃ ১-১০

চিন্তা করুন ঃ ঈমানের পরীক্ষা ও সাফল্য লাভের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের অপরিহার্যতা।

(৮.১) দেখুন– ২ ঃ ১৫৫, ২ ঃ ২১৪, ৩ ঃ ১৪০-২, ৩ ঃ ১৭৯, ৪৭ ঃ ২৯-৩১।

(৯) সূরা আল আনফাল ঃ ৭২-৭৫

ঈমানের সাথে হিজরাত ও জিহাদের গভীর সম্পর্কের কথা চিন্তা করুন। জিহাদের জন্য সামষ্টিকতার অপরিহার্যতা।

(১০) সূরা আত্ তাওবা ঃ ১৯-২৪

ভেবে দেখুন ঃ আল্লাহর মিশনের পূর্ণতার জন্য সামষ্টিক জীবনের মূলভিত্তি হচ্ছে অনুগত্য ও নবীর ডাকে সাড়া দেয়া।

(১০.১) দেখুন– ৮ ঃ ২০-২৮, ৪৯ ঃ ১-৫, ৫৮ ঃ ১১-১৩, ৯ ঃ ৪২-৫৭, ৯ ঃ ৬২-৬৬, ৯ ঃ ৮১-৮২, ৬২ ঃ ৯-১১।

(১১) সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-২০০

একটি পূর্ণাঙ্গ সারসংক্ষেপ ঃ আল্লাহ, আখিরাত, রিসালাত, জান্নাত ও পৃথিবীর সৃষ্টি, দিন-রাত্রির আবর্তনের প্রমাণ, সর্বদা আল্লাহর স্মরণে জীবন পরিচালনা, পরকালই চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহর প্রেরিত নবীর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস, সংগ্রাম ও পরীক্ষার তাৎপর্য, সামষ্টিক জীবনের হিদায়াত।

এটা ধরে নেয়া হয়েছে উপরে উল্লিখিত সিলেবাসটি একটি বড় কোর্সের অংশ হিসেবে অধ্যয়ন করা হবে। আর এজন্যই মুসলিম জীবনের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক গুণাবলী সম্পর্কে কোন কিছুই এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তা যদি না হয়, তাহলে নিম্নোক্ত অংশটুকু যোগ করে নিলে বেশ উপকারে আসবে। আল ইসরা– ১৭ ঃ ২৩-৩৯, আল ফুরকান– ২৫ ঃ ৬৩-৭৭, লুকমান– ৩১ ঃ ১২-১৯, আল হুজরাত– ৪৯ ঃ ১০-১৪। ■

১৩ ঃ দীর্ঘ সিলেবাস ঃ ৪০টি অংশ

সাপ্তাহিক পাঠচক্রের জন্য ১ বছরের কোর্স

(১) সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৭-৭৮ ঃ জিহাদ ও বন্দেগীর জীবন, শাহাদাতের মিশন।

(২) সূরা আত্ তাওবা ঃ ১১১-১১২ ঃ ঈমানের অংগীকার বন্দেগীর জীবন।

(৩) সূরা আন্ নিসা ঃ ১৩১-১৩৭ ঃ ন্যায়বিচারের সাক্ষ্য, ঈমানের ডাক।

(৪) সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২-১১০ ঃ উম্মাহর উদ্দেশ্য।

(৫) সূরা আল ফাতহ ঃ ৪-১১ ঃ নবীর মিশন অব্যাহত রাখার অংগীকার।

(৬) সূরা আল বাকারা ঃ ৪০-৪৬ ঃ অংগীকার পূরণের আহ্বান।

(৭) সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ১-১০, ২০ ঃ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা।

(৮) সূরা আল ইসরা ঃ ২৩-৩৯ ঃ ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক নৈতিকতা।

(৯) সূরা আন নাহল ঃ ১-১১ ঃ তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতের প্রমাণ।

(১০) সূরা আন নাহল ঃ ১২-২২ ঃ তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতের প্রমাণ।

(১১) সূরা ইউনুস ঃ ৩১-৬ ঃ তাওহীদের প্রমাণ ও হিদায়াত।

(১২) সূরা হাজ্জ ঃ ১-৭ ঃ আখিরাতের প্রমাণ।

(১৩) সূরা কাহাফ ঃ ১-১৮ ঃ আখিরাত।

(১৪) সূরা আল মুমিনুন ঃ ১১৮ ঃ আখিরাত।

(১৫) সূরা ইয়াসীন ঃ ৫০–৬৫ ঃ আখিরাত।

(১৬) সূরা ক্বাফ ঃ ১৯-৩৫ ঃ আখিরাত।

(১৭) সূরা আয্ যুমার ঃ ৫৩-৫৬ ঃ আখিরাতের প্রস্তুতি।

(১৮) আল হাশর ঃ ১৮-২৪ ঃ আখিরাতের প্রস্তুতি ও আল্লাহর গুণাবলী।

(১৯) আল হাদীদ ঃ ১-৭ ঃ আল্লাহর গুণাবলী, ঈমান এবং আল্লাহর পথে খরচের আহ্বান।

(২০) আল হাদীদ ঃ ১২-১৭ ঃ ঈমান ও ইনফাক।

(২১) আল হাদীদ ঃ ২০-৫ ঃ বর্তমান জীবন, ইনফাক, ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

(২২) সূরা আস্ সাফ ঃ ৯-১৪ ঃ নবীর মিশন, ঈমান ও জিহাদের প্রতি আহ্বান।

(২৩) সূরা আল আনকাবুত ঃ ১-১১ ঃ বিশ্বাসের পরীক্ষা।

(২৪) সূরা আল আনফাল ঃ ৭২-৫ ঃ ঈমান, হিজরাত, জিহাদ, জামায়াত।

(২৫) সূরা আন নিসা ঃ ৯৫-১০০ ঃ হিজরাত ও জিহাদ।

(২৬) সূরা আত্ তাওবা ঃ ১৯-২৪ ঃ জিহাদ, সর্বোচ্চ আমল, সবকিছু ত্যাগ করা।

(২৭) সূরা আত্ তাওবা ঃ ৩৮-৪৫ ঃ জিহাদ।

(২৮) সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-৭৫ ঃ আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ।

(২৯) সূরা আল বাকারা ঃ ২৬১-৬ ঃ ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ।

(৩০) সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭-৭২ ঃ ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ।

(৩১) সূরা আল আনফাল ঃ ২০-৯ ঃ সামষ্টিক জীবন, আনুগত্য।

(৩২) সূরা আন নিসা ঃ ৬০-৭ ঃ সামষ্টিক জীবন, আনুগত্য।

(৩৩) সূরা আন নূর ঃ ৪৭-৫২, ৬২-৪ ঃ সামষ্টিক জীবন, সাড়া এবং আনুগত্য।

(৩৪) সূরা আল হুজরাত ঃ ১-৯ ঃ সামষ্টিক জীবন, নেতৃত্বের সাথে সম্পর্ক।

(৩৫) সূরা মুজাদালা ঃ ৭-১৩ ঃ সামষ্টিক জীবন, নিয়ম-নীতি ও দায়িত্ব।

(৩৬) সূরা আল হুজরাত ঃ ১০-১৫ ঃ সামষ্টিক জীবন, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক।

(৩৭) সূরা আল মুরসালাত ঃ ৩০-৬ ঃ দাওয়াত এবং প্রয়োজনীয় গুণাবলী।

(৩৮) সূরা আল বাকারা ঃ ১৫০-৬৩ ঃ মিশন এবং এর দায়িত্ব।

(৩৯) সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫-৯২ ঃ সারমর্ম।

(৪০) সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৩-২০০ ঃ সারমর্ম।

৪০টি অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে ৫২ সপ্তাহের জন্য। ধরে নেয়া হয়েছে যে, কোন কোন সপ্তাহ বাদ যাবে না কোন কোন অংশ শেষ করতে একাধিক সপ্তাহ লেগে যাবে। যাই হোক যদি সহজলভ্য হয়, তাহলে কুরআনের ইতিহাস সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলোর

দিকে মনোনিবেশ করা যেতে পারে, যা আমি এখানে অন্তর্ভুক্ত করিনি। এ ব্যাপারে প্রতি সপ্তাহের জন্য একজন করে নবী যেমন নূহ (আ) অথবা হূদ (আ) সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে। সূরা আল আরাফের এককেটি অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে এ প্রসঙ্গে কুরআনের প্রমাণিত আয়াতসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

১. আল আরাফ ঃ ৫৯-৬৪

২. আল আরাফ ঃ ৬৫-৭২

৩. আল আরাফ ঃ ৭৩-৯

৪. আল আরাফ ঃ ৪০-৪

৫. আল আরাফ ঃ ৪৫-৯৩

৬. আল আরাফ ঃ ৯৪-১০২

৭. সূরা হূদ ঃ ১১৬-২৩